বহুপথ হেঁটে
এসে
অন্তু বিশ্বাস

Bohu Poth Hete Ese (Novel)

By Antu Biswas

প্রকাশকঃলেখক

প্রচ্ছদ নির্মাণঃ লেখক

মূল্যঃ বইটি ফ্রি

উৎসর্গঃ

আমার সেজো জেঠিমা কে (তিনি নেই)

অথচ যাকে প্রতিদিন মনে পড়ে।

কিছু কথাঃ

এই সমাজ আমাদের।আমরা কত সম্পর্কে একে অন্যের সাথে যুক্ত।কখনো তা একেবারে সরল আবার কখনো খুব জটিল।এই উপন্যাসে দুই-একটি সম্পর্ককে একটু দেখানোর প্রয়াস চালানো হয়েছে মাত্র।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,বইটি পড়ার সিদ্ধান্ত নেবার জন্য শুভেচ্ছা রইল। আপনাদের মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বহুপথ হেঁটে এসে

১

মাটির মতো শ্রীবাস মন্ডল আজও বুঝতে পারলো না কোন অপরাধে তার এই শাস্তি।কোনো দিন কারো কোনো ক্ষতি করেছে —সচেতনভাবে তা তার মাথায় আসে না।শুধু একটা প্রশ্নই বারবার করে,“কোনো দিন ভাবি নি এমন হবে।ঈশ্বর, কী করেছি আমি, তার জন্য—?”

অনিমা চুপ করে থাকে না,“আমাদের ভাগ্যে ছিলো এই।যতদিন খেতে পারি ততোদিন খাই।তারপর দেখবো।না হয় দুজন বৃন্দাবন চলে যাবো।”

অনিমা এভাবে কোনোদিন শ্রীবাসের সাথে কথা বলে নি।যখন শ্রীবাস ওকে বউ করে ঘরে আনে,তখন থেকেই বাড়ীতে অনিমার কেমন যেন একটা আলাদা প্রতিপত্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিলো।এর অবশ্য কারণ ছিল—অনিমার বাপের বাড়ীতে বেশ সম্পত্তি ছিল।বিয়ের সময় কত কিছু দিয়েছিলো। তারপর এক সাথে এই চল্লিশ বছর হতে গেলো।দুই ছেলে তাদের।বিয়ে করে সংসারী তারা। আলাদা খায়।

যখন বড় ছেলে পিন্টু বিয়ে করে এলো তখনও এক সাথে ছিলো সবাই।তারপর বিয়ে করে ছোট ছেলে মিন্টু।এক সময় অনিমা দেখে,তাদেরকে নিয়েই ছেলেদের যত ঝামেলা।একদিন শ্রীবাসকে বলে,“এভাবে আর পারা যায় না।চলো দু'জন মরি। না হলে আলাদা খাই।”

শ্রীবাস কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবে নি। কিন্তু সেই সময় কেমন যেন ভাবতে হয়েছিল।সংসারে কত ঝড় গিয়েছে;তবুও শক্ত খুটি ছিল অনিমা।তার এমন ভেঙ্গে পড়া দেখে শ্রীবাসের কিছু বলার ছিল না।তবুও বলে,“লোকে কি বলবে?এভাবে যদি আলাদা খাই?”

—“লোকে যা বলে বলুক।এ দুঃখ লোকের না।আমাদের।সব এক একটা

আসে। আর এসেই..... ”

এসেই কি করে ওরা দেখছে এই কয় বছরে।প্রথম প্রথম দাঁতে দাঁত কামড়ে ছিল।তবে একদিন ঠিকই আলাদা সংসার হয় ওদের।দুজনের সংসার।যখন ছেলেদের জন্ম হয় নি তখনো অত ছোট সংসার ছিল না।

প্রথম কয়দিন শ্রীবাসের কেমন কেমন লাগছিল।পাড়াময় একটা রব পড়ে গিয়েছিল।সবাই যেন সহানুভূতি নিয়ে আসতো।কেউ একটু সান্ত্বনা দিতে আসতো;কেউ আবার বলত,“শ্রীবাস তুইই ঠিক করেছিস.......অত ঝামেলার থেকে।যতদিন করে খেতে পারিস এভাবে খা।” তখন কিছু বলতো না।মনের মধ্যে আগুন জ্বলতো।সে আগুন কেউ দেখতে পেতো না।তবে শ্রীবাসের এখন যেন মনে হয়,স্বামী-স্ত্রী দুজন খাওয়াতে সত্যিই তো আনন্দ আছে!স্বাধীন ভাবে থাকা যায় অন্তত;কারো কঠোর কথা হজম করতে তো হয়। এক বেলা না খেয়ে থাকা যায় কিন্তু অপমান সহ্য করা যায় না।

বড় ছেলে পিন্টুর যখন জন্ম হল, তখন মাঠে ছিল সে—পাটের ক্ষেতে নিঙড়ানী দিচ্ছিল।কে যেন খবর দিল,“ শ্রীবাস,তোর ছেলে হয়েছে একটা.....।”

শ্রীবাসেরও মনে হচ্ছিল আর বেশি দেরি নেই।অনিমার এক কষ্ট কষ্ট হচ্ছিল তা বুঝেই সে মাঠে এসেছিল। ছেলে হওয়ার খবর শুনে কি এক আনন্দে ওর মন ভরে ওঠেছিল।আর কাজ করতে মন চাইছিল না।পাশের জমিতে অন্নধরও পাট নিঙড়াচ্ছিল,যাবার পথে ওকে বলল,“অন্ন আমার একটা ছেলে হয়েছে।দেখি যাই।"

—“শ্রীবাস দা, মিষ্টি কিন্তু খাওয়াতেই হবে।”

“কত খাবি খাস।”বলে মাথায় এক বোঝা ঘাস নিয়ে বাড়ী ফেরে সে।দেখে বারান্দাটা কাপড় দিয়ে ঘেরা।অনেকেই ঘোরা-ফেরা করছে।একটা কুকুর ডাকছে।হঠাৎ একটু মানুষের সমাগম দেখে ওর কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।তাই ডেকে ডেকে একেবারে একাকার করে ফেলছে।শ্রীবাস একটা লাঠি নিয়ে তাড়া করে দেয়। আজ ওর ভালো লাগছে।এত মানুষকে আজ ওর অতিথি মনে হচ্ছে। তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলারা।পুরুষেরা দুই একজন এলেও দূরে বসে হুকা টানছে।

শ্রীবাস এখনও দেখে নি,যে নতুন এসেছে— তাকেও আর অনিমাকেও।কিন্তু মনে মনে কত কিছু দেখে নিয়েছে।ছেলেকে তার লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করবে।যত কষ্ট হোক।একটু বড় হলে ওই পাড়ার অপূর্ব মাস্টারের কাছে পড়তে দেবে।ভাবছে,এখন একদিন বলে রাখবো।মাঝে মাঝে দেখা হলে কথা হয়।এই সব ভাবতে থাকে হুকোটা টানতে টানতে। কেউ একজন বলে,“ শ্রী —তোর ছেলে হয়েছে মিষ্টি কোথায়?”

শ্রীবাসও মনে মনে ভেবেছে সে কথা।কিন্তু কেউ না বললে একা একা গিয়ে বাজার থেকে মিষ্টি আনতে ওর কেমন যেন লাগছে।এবার আর দেরি করে না সে।জামাটা পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠতে উঠতে বলে,“তোমরা কেউ যেও না,আমি মিষ্টি আনতে যাচ্ছি।”পকেটে যে টাকা ছিল বেশি তা কিন্তু নয়।কিন্তু আজকে ওর ওসব কিছু ভাবার সময় নেই।ওর যে একটা একান্ত নিজের কিছু এসেছে আজ।একেবারে নিজের।

সেই পিন্টুও এখন বাবা হয়েছে।কত কিছু পাল্টে গিয়েছে।লেখাপড়া অবশ্য কিছুটা করেছিল।তারপর এখন ইলেকট্রিকসের কাজ শিখে দোকান দিয়েছে।দোকানে কত জিনিস তার।

পিন্টুর মেয়েটা মাঝে মাঝে আসে ঠাম্মা-ঠাকুরদাদার কাছে।তবে ওর মা চোখে চোখে রাখে।ওইদিনও এসেছিল। একটু পরে ওর মা ওকে নিতে আসে,“জোনাই, আয়, ভাত খাবি।”

কিন্তু জোনাই তো খাচ্ছে।ওর ঠাম্মা পাকা কলা দিয়ে জল ঢেলে মেখে দিয়েছে।তাই ভালো খাচ্ছে।জোনাইয়ের মা র যেনো রাগ হয়ে গেলো—ওই হাতেই তো ওনি গোবর তোলে।কেমন যেন গা ঝিনঝিন করে ওঠে কাবেরীর।তখন কিছু বলে না।মনে মনে মেয়ের পরে রাগ হয়—এতো খাবার এনে দেয়।তবুও ফাঁক পেলে এঘরে আসবেই। আজ ঘরে নিয়ে বেশ একটা শিক্ষা দিতে হবে।

“ওঠ চল,তুই খাবি বলে আমি আরো তাড়াতাড়ি রান্না করলাম” কাবেরী একটু তাড়া দেবার ভঙ্গি করে বলে জোনাইকে।তাছাড়া ফ্যান বন্ধ।মেয়েটা তার ঘেমে একাকার হয়ে গেছে।আবার বলে,“চল,দ্যাখ ঘেমে জল হয়ে যাচ্ছিস।” যদিও

অনিমা পাশে বসে বাতাস করছিল।সে কিছু বলে না।অনেকদিন কাবেরীর সাথে কথা বন্ধ ওর।

কাবেরী ওর শাশুড়ীকে বলার নাম করে জোনাইকে বলে,“ফ্যান, চালাস নি কেন?"

—“ফ্যান তো নষ্ট হয়ে গেছে।”জোনাই বলে ওঠে।ওর পাতে এখনো ভাত পড়ে।আর খাবে না। তবুও যেতে চাইছে না।

মাঝে মাঝেই রাত্রে আসে জোনাই। বলে, "ঠাম্মা, গল্প বলো….."

অনিমা বলে, সেই রাখালের পিঠা গাছের গল্প, সাতভাই চম্পার গল্প।ও শোনে; শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যায়।কোনো দিন পিন্টু এসে আবার কোনোদিন কাবেরী এসে নিয়ে যায়।

পরদিন সকালে দোকানে যাবার আগে ফ্যানটি খুলে নিয়ে যায় পিন্টু।তবে মা-বাবার সাথে কোনো কথা বলে না।ওরাও চুপ করে থাকে।শ্রীবাস মনে মনে ভাবে, কি হল ব্যাপারটা।

অনিমা বুঝতে পারে,কাল রাত্রে যখন জোনাই এসছিল তখন শ্রীবাস বাজার থেকে ফেরে নি।এতদিন শ্রীবাসের সাথে থাকতে থাকতে ওর মনটাকে ও বোঝে।শ্রীবাস যে এই বিষয়েই জানতে চাইছে।পিন্টু চলে গেলে, সব কিছু খুলে বলে ওকে।কাল যে বড় বৌমা এসে—।

শ্রীবাসের দীর্ঘ দিনের অভ্যেস বাজারে গিয়ে চায়ের দোকানে বসা।টি.ভি তে খবর দেখা।প্রায়ই রাত করে ঘরে ফেরে।অনিমা একা একা থাকে বলে ওর একটু ভাবনা হয়—তবে বাড়ী থাকলে ভালো লাগে না কিছু।ঘরে একটা টি.ভি থাকলেও হতো।দুজনে দেখতো।ইচ্ছে আছে—সামনে ধান উঠলে একটা টি.ভি নেবে।একেবারে বড় না।ছোট খাটো।ঠিক ওদের দুজনের সংসারের মতো।

২

অনিমার বাপের বাড়ীর বেশ খানিকটা সম্পত্তি পেয়েছিল।তাই বিক্রি করে এখানেই এক দাগে অনেকটাই জমি রাখে।কোনো দিন অভাব হয় নি।আর শ্রীবাসও বসে থাকে না।ধানের সময় ;পাটের সময় –ব্যস্ত থেকে থেকে ঘরে তুলতো ফসল।অনিমাও খাটতো।

এখন সেই সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেছে।এক বিঘের মতো ওদের নামে আছে।বাকীটুকু দুই ছেলের নামে লিখে দিয়েছে।এত তাড়াতাড়ি লিখে দেবার পক্ষপাতি অনিমা ছিল না।কিন্তু ছেলেরা ওই জমি নিয়ে সকাল বিকেল ঝগড়া করবে ভেবে আর বাধা দিলো না।

ছোট ছেলে মিন্টুর মাঠে খাটার কোনো অভ্যেস নেই।তাই জমিটুকু বিক্রি করে ঘর জুড়েছে।অনিমা বলে,"আমরা ওর কেউ না,ওর শশুড়-শাশুড়ীই ওর মা-বাপ।" অনিমার মনে হয়, ওদের কথা শুনেই ওই জমিটুকু খেলো।এই বাজারে, জমির যে দর –তা বিক্রি করে কেউ ওই ভাবে নষ্ট করে।আরে ঘর করবি,তা নিজে খেটে কর।জমি বিক্রি করে কেন!

ওই জমিতেই তো এক সময় শ্রীবাস পড়ে থেকেছে।পাখি ডাকা ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেছে।ভোর থেকে দুপুর অব্দি।মাঝে অনিমা রান্না করে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে এসেছে।ভালো ফসলের জমি।সেই জমির চোখের সামনে এমন নয়-ছয় দেখে শ্রীবাসও ঠিক থাকতে পারে না।বলে, "আর জন্মে কোনো পাপ করেছিলাম–"

তবে ওদের নামে যেটুকু আছে সেইটুকুই চাষ করে।বছরের ধানটা হয়ে যায়।তাছাড়া ব্যাংকে কিছু টাকা আছে।আর মাঝে মাঝে দুই একটা জনে যায় শ্রীবাস।তাতে করে হাট চলে যায়। ছেলেদের কাছ হাত পাতে না।বেশি একটা জোরের কাজ করতে পারে না–বয়স হয়েছে।

প্রতিবার খাওয়ার পরে হুকো না খেলে যেন মাথা ঠিক থাকে না

শ্রীবাসের।আগে সবার হাতে হাতে থাকতো।এখন সেইভাবে কেউ খায় না।সবাই বিড়ি খায়; সিগারেট খায়।তবে শ্রীবাসের কেমন যেনো হুকোই ভালো লাগে বেশি।ও বলে,“বিড়ি সিগারেটের থেকে হুকো খাওয়াই ভালো,ধোঁয়াটা জলে ফিল্টার হয়ে আসে।তেমন একটা ক্ষতি হয় না।”

তবে হুকো ধরাতেই চিটেগুড় আর তামাক পোড়া বাষ্পের একটা তীব্র গন্ধ পাড়াময় ছড়িয়ে পড়ে।হাওয়ায় হাওয়ায় আরো অনেকদূর চলে যায় তা।সেই গন্ধের টানে দুই একজন পুরোনো পার্টনার আসে।তারা এখন হুকো রেখে বিড়িতে আছে।তবে শ্রীবাসের বিড়ি ততো একটা প্রিয় না।মাঝে মাঝে দুই এক টান দেয়।তবে কিনে না—যদি কেউ দেয়!

এই নিয়ে সেদিন বড় বৌ সে কি ঝগড়া,“ছেলে-মেয়েদের কত ক্ষতি হচ্ছে তা কি জানে?প্রতিদিন নাকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বিষ।আমাদের তা–ই অসহ্য লাগে।আর ছোটোরা।”

শ্রীবাস কিছু বলে না।মনে মনে ভাবে, পিন্টু-মিন্টুর সামনে কতদিন তো খেয়েছি এক সময়—।তবে সে কথা আর বড় বউয়ের কান পর্যন্ত যায় না।মনের কথা মনেই থেকে যায়।অনিমা বলেছে,“তুমি এক কাজ করো, একটু দূরে গিয়ে খেয়ে এসো।যদি ওতে ওদের কোনো ক্ষতি হয়?”

আসলেই ওরা কারো কোনো ক্ষতি চায় নি।সবই তো নিজের রক্তের।ছোট বৌমার ছেলেমেয়ে হবে।কি হবে তা জানে কে।তবে অনিমার ইচ্ছে—একটা ছেলে হোক।বড় বউয়ের একটা মেয়ে, ছোট বউয়ের একটা ছেলে।আর এ কথা সে শ্রীবাসকে ছাড়া আর কাকে বলবে।পাড়ার সকলে কেমন যেন হয়ে গেছে।আসলে বয়স্কদের এই একটা সমস্যা!গণনার মধ্যে রাখে না কেউ,অগ্রাহ্য করতে চায়। শাসন করতে চায়।খানিকটা ঠিক—রাজ্য হারা রাজাকে বন্দি করলে যেমন তার মনের অবস্থা দাড়াতো ঠিক তেমনই।

অনিমাকে শ্রীবাস বলে রেখেছে,“ওই এক বিঘের একটুও কাউকে দেবো না।আর এই বাড়ীর জমির যতটুকু আমাদের আছে তার একটুও কাউকে দেবো না।ওই জমি বেচে এখানে মন্দির করবো মরার আগে।”

জানে ঈশ্বর ওদের সহায় হয় নি।কিন্তু সে কথা শ্রীবাস ভাবে না।মারা গেলে ওই সম্পত্তির কি হবে—এ নিয়ে অনেক ভেবে তবেই এটা পেয়েছে সে।যে টাকা ব্যাংকে আছে তাতে করে যেভাবে চলছে,কুড়ি বছর চলতে পারবে।ওই টাকাগুলো আসলে অনিমার গহনা বিক্রি করার টাকা।ওইগুলোই এখন সম্বল ওদের।দিনের ভরসা।

মিন্টু ঘর করবার সময় ওর বাবাকে বলেছিল কিছু টাকা দিতে। কিন্তু সাফ জানিয়ে দিয়েছে দিতে পারবে না।ঘর কি ওর ছিল না।মিন্টু যে ঘরে থাকতো, সেই ঘরখানি তৈরির কথা মনে পড়ে শ্রীবাসের—

একেবারে বেশিদিন আগেরও না।পিন্টু-মিন্টু ওরাও বেশ বড়।টালির ঘর ছিল আগে।কিন্তু ঝড়বাদলে কখন ভেঙ্গে পড়ে।তাছাড়া,গ্রামে সবার বাড়ী টিন এসে গেছে।নির্মল মিস্ত্রী বানিয়েছিল এ ঘর।কোথাও কোনো কমতি রাখে না।সুন্দর করে জানালা তৈরি করেছিল।যাতে দক্ষিণের হাওয়া ঢোকে।ঘরটা একটু ঠান্ডা থাকে।

এখন সেখানে দালান। ঘরখানি এক পাশে সরানো।শ্রীবাস মাঝে একবার বলতে গিয়েও বলে নি, যে ঘরখান একটু ঠিক কর।কি বলতে না কি বলে বসে, সেই ভয়ে।এটা কি সব বাবাদের ক্ষেত্রে হয় কি না জানি না—এক সময় যে বাবারা কত স্নেহ দিয়ে বড় করে, সেই ছেলেকে বাবা এক সময় সমীহ করে চলে।এটা জানি না, সন্মান নামক ব্যাপারটার কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিনা।না বয়সের অমোঘ নিয়ম!

৩

বাড়ীর পাশেই একটা বিয়ে।নিমন্ত্রণ আছে এ বাড়ির সবার।যখন নিমন্ত্রণ করতে আসে তখন বড় বউ জোনাইকে নিয়ে উঠোনে দাড়ানো। বিকেলবেলা।অনিমাও ঘরের বাইরে কি করছিল।লোকটা এসে কাবেরীকে নিমন্ত্রণ জানানোর পর জিজ্ঞেস করল,"তোমার শাশুড়ীকেও বলতে হবে নাকী?"

—"হ্যাঁ বলে যাও।"এর আগেও অনেকবার এমন হয়েছে।সে বেচারাও কেমন যেন লজ্জিত বোধ করে।শশুর-শাশুড়ীর আলাদা সংসার!

"বিয়ে তো কিছু একটা নিয়ে যেতে হয়।কি নেবে?"জানতে চায় অনিমা।শ্রীবাসও সকাল থেকে ভাবছে।বলে "একটা শাড়ী নিয়ে আসি।"

সন্ধ্যার একটু পর পরই ওরা বিয়ে বাড়ী যায়।আলো ঝলমলে। সাউন্ড বক্সের জোর শব্দে অনিমার কান ঝালাপালা দিয়ে যায়।বাচ্চা-কাচ্চা ছেলেপেলেদের কিছু বলতেও পারে না।আসলে শব্দের জোর থেকে রক্তের জোর বেশি তা সে জানে। তাই একটু ঘুরপথে যায় ঢোকে ওরা।বউ সেজে বসে আছে মেয়েটা।কতই বা বয়স ওর।পিন্টু-মিন্টুরও অনেক ছোট।পাড়ায় পাড়ায় খেলে বেড়াতো—পুতুল খেলা;আম কুড়িয়ে বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে কত বকা শুনতো।আজ ওকে ঘিরে কত কোলাহল। কত বড় হয়ে গেছে সে।

বয়স্ক আর ছোটদের নিয়ে প্রথম বৈঠক শুরু হল প্যান্ডেলে।সাদা কোচা দেওয়া কাপড় দিয়ে ঘেরা।উপরে লাইট জ্বলে। অনিমাদের সময় এতো ছিল না।হ্যাজাকের আলোয় অনিমার বিয়ে হয়েছিল।খাওয়ার বন্দ্যোবস্ত হয়েছিল মাটিতে।কলাপাতায়।সে কত দিন আগের কথা।

ওরা গিয়ে বসল।তখন খাওয়া প্রায় অর্ধেক।বাইরে দেখে পিন্টু ওর বউকে নিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছে।জোনাই ওদেরকে দেখে 'ঠাম্মা ঠাম্মা' করে।

অনিমার মনে অনেক ঝড় বয়ে গেলেও, শ্রীবাসের মনে টু শব্দটিও হয় না।কি নিয়ে কখন ভাবতে হয় তা সে জানে না।এই নিয়ে অনিমা কত বেশি কথা বলে ওকে।এখনো মাঝে মাঝে অনিমার রাগ হয়ে যায়।ডাক দেয় শ্রীবাস, “আয়, আয়।”

জোনাই বাবার কোল থেকে ঝাপ দিতে চায়।বোঝা যায়–বাইরে ভিড় জমে গেছে।পরের বার টেবিলের জন্যে এখনই চলছে খোজ। বিয়ে বাড়ি বল আর শ্রাদ্ধবাড়ি বল এ এক ভারি স্পর্শকাতর ব্যাপার। চেনা কেউ না থাকলে তিন বৈঠক পার হয়ে গেলেও জায়গা নাও পাওয়া যেতে পারে।আবার কারো পরিচিত কেউ থাকলে এক বৈঠক পরেই বসা যায়।অনিমার তা ভালো লাগে না।যতই কাছে হোক –তাই আগের বৈঠকেই খেয়ে নেয়।যদিও মনে মনে একটু কেমন লাগে।তবুও কটা খাবার জন্য, অমন প্রতিযোগিতায় নামার মতো মানসিকতা নেই অনিমার।তাই শ্রীবাসকে বলে,“নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গেলে আগেই খেয়ে নিবো।"

পিন্টু জোনাইকে ওর মা'র কাছে রেখে প্যান্ডেলে ঢোকে।খাওয়া প্রায় শেষের পথে।অনায়াসে আসতে পারতো মা-বাবার কাছে।ওদের পরবর্তী সিট খালি ছিল।ওরা দ্যাখে অন্য কার সাথে কথা বলে বেরিয়ে যায়।বোঝা যায়, ওখানেই পরের সিটে বসবে।ওরাই যেন একমাত্র শত্রু ওর।কেমন অদ্ভুত ব্যাপার!

খেয়ে আসতে আসতে শ্রীবাস বলে,“পিন্টুর মা, দেখলে তো, আমরাই যেন ওর শত্রু?”

শ্রীবাস অনেক কিছু না বুঝলেও এমন এমন দার্শনিক কথা বলে।তবে মনে হয়না খুব একটু গভীরভাবে ভেবে বলে কিছু।কিন্তু অনিমারও তো তাই মনে হয়।বলে,“তাইই তো। আমরা ওদের জন্ম দিয়ে পাপ করেছি।”

ওরা লাইট নিয়ে ধীরে ধীরে হেটে বাড়ী আসে।এখন শ্রীবাস তেমন একটা খেতে পারে না।আগে এক বড় বাটি মাংস দেখতে দেখতে খেতে পারতো।ভাতও খেতে পারতো প্রচুর।অনিমা তা প্রথম দিন এসেই বুঝেছিল,খাটনির শরীর। লাগবেই তো।

আসতে আসতে শ্রীবাসের মনে হয় একটু মদ খেতে পারলে ভালো হতো।তবে অনিমাকে ওর ভয় পায়।আর এখন কার কাছেই বা চাইবে।বেশ কয়দিন আগে একটা বৌভাত বাড়ী।একটু মদ খাওয়ার ইচ্ছে জেগেছে ওর।যেখানে দেওয়া হয় সেখানে যেতেই দ্যাখে মিন্টুটা বসে আছে।ফিরে আসে সে!

৪

রাত্রে মাঝে মাঝেই মদ খায় শ্রীবাস।অনিমা কত বকে।কিন্তু শোনেই না।ফিরে এসে বলে,"তুই আমারে মদ খেতে বাধা দিস কোন সাহসে?আমি দুঃখ ভুলতে চাই?তুই ভুলবি নাকি— আয়?"কথাগুলো জড়িয়ে আসে।

মদ খেলে কেমন অনুভূতি হয় অনিমা তা জানে না।জানার চেষ্টাও করে না।তবে ওই বিকট গন্ধ একটুও ভালো লাগে না,বলে," বারান্দায় শোও।"বারান্দার চৌকিতেই শুয়ে পড়ে।সে কী গভীর ঘুম।শুধু বুক থেকে বেরিয়ে আসে বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ।

রাত্রে মাঝে মাঝে ওঠে অনিমা লাইট জ্বালিয়ে মুখটি দেখে শ্রীবাসের।কী একটা টান অনুভব করে মানুষটার প্রতি।এখনকার ছেলেমেয়েরা কথায় কথায় ভালোবাসি ভালোবাসি বলে।কিন্তু সেই ভালোবাসা-ভালোবাসি ওদের মধ্যে কোনোদিন হয় নি।তবুও তো ওরা ভালোবাসে দুজন-দুজনকে। ওদের জীবনটা এখন রহস্যে মোড়া কোনো দ্বীপের মতো।যদি কেউ একটু আগ্রহ নিয়ে জানতে চায় কত কিছুই না জানতে পারবে!

গত রাতে কাজ ঠিক করা থাকলে সকালে উঠেই চলে যায়।কাজ না থাকলে চায়ের দোকানে গিয়ে বসে।কত খবরাখবর প্রতিদিন। সবচেয়ে খারাপ লাগে,মৃত্যু।ততক্ষণে রান্না করে অনিমা।ধীরে ধীরে রান্না করে সে।সেদিন খেতে বসে শ্রীবাস বলে," রাত্রে, খিচুড়ি রান্না করো।অনেকদিন খিচুড়ি খাই না।"

সত্যি সত্যি খিচুড়ি রান্না করে।জোনাইকে ডেকে একটা থালাতে দেয়।ও ধরে নিয়ে যায় ওদের ঘরে।মাঝে মাঝে বড় বউও পাঠিয়ে দেয় তরকারি। অনিমা

ফিরিয়ে দেয় না।বেশ সুন্দর হয় বড় বউয়ের তারকারি।

খেতে বসে শ্রীবাস বলে,“বাজার থেকে শুনে এলাম মিন্টু নাকি বাইরে যাবে?কাজ করতে?”

অনিমাও জানতো না।“কি দরকার এই অবস্থায় যাওয়ার—বউটার এই অবস্থা।” কিন্তু ওর এই পরামর্শ শুনবে কে আর বলবেই বা কাকে? মিন্টুও তো কথা বলে না।বড় বৌমা-ছেলে যাইহোক একটু চোখ-টোকে রাখে।কিন্তু ওরা যেন অনেক দূরের হয়ে গেছে।

অনিমা আবার বলে,“মনে হয় টাকা পয়সায় শর্ট পড়েছে। তাই যাচ্ছে।”

শ্রীবাস মাথা নাড়ে।ভাত ওর খাওয়া শেষ।কিছু না বলে, এক মুখ জল নিয়ে কুলিকুচি করতে করতে বেরিয়ে যায়।তারপর অনিমা খেতে বসে।

খেতে খেতে অনিমা ভাবে মিন্টুকে বললে কেমন হবে, এখন যাস না।কিন্তু যদি রেগে যায়?ছোটবেলা থেকেই ওর রাগটা একটু বেশি।আর সেও তো বলে নি!কি করে বলবেই বা তা, বুঝতে পারে না।মিন্টুর বিয়েতে মোটেই রাজি ছিল না ওরা।মেয়েটা এক আত্নীয় বাড়ী ওদের বাড়ীর পাশে।এখানে আসতে যেতে মিন্টুর সাথে সম্পর্ক। বিয়ের আগে মিন্টু কত ভালো ছিল।বউ এসেই ওর মাথা খেয়েছে।যদিও প্রথম কয়দিন রান্না বাড়া করে ওদের বেশ খাইয়েছিল।

একদিন রাত্রে খেতে বসেছে ওরা দুজন।শ্রীবাস আর অনিমা।এভাবে খাওয়া ওদের কোনো দিন হয় নি।অপরের যখন বোঝা হয়ে যেতে হয়, তখন যে যেভাবে তা বহন করবে, সেভাবেই তাকে থাকতে হয়।একদিন বলেছে,ওর বাবা আগে খেয়ে নিক তারপর খাবো।কিন্তু ছোট বউমার যেন মনে হয়, খাইয়ে দিতে পারলে তিনি বাঁচেন।আর এই খাওয়ানোটাই যেন তার কাছে খুব ঝামেলার ব্যাপার।মুখ বুজেই খেয়ে উঠে যায় ওরা।তেমন একটা চেয়ে কিছু নেয় না।শ্রীবাসের বয়সের ভাব এলেও খাওয়াটা একেবারে কমেছিল না।কিন্তু এই কয়দিন, একবার ভাত পাতে দিলে আর চায় না।যা দেয় তাই খেয়ে উঠে যায়।কিছু বলে না।অনিমা বুঝতে পারে। পরের মেয়ে নিজের মা-বাবাকে শুধু বুঝতে পারে,অন্যের মা-বাবাও মা-বাবা হওয়ার দাবী রাখে সে কথা ভুলে যায়।

ভাতের থালাটা অনিমাকে এমন ভাবে ঠেলে দিলো—খুব আঘাত লাগলো অনিমার।মনে হয়েছিল,রেখে উঠে যাস সে।কিন্তু সে তা পারে নি।

৫

হাটবার।হাট থেকে এলেই জোনাইয়ের ডাক পড়ে।শ্রীবাস ডাকে,“ও জোনা,দেখে যা কি এনেছি। ”

ওকে বিকেলের দিকে ওর ম্যাডাম পড়াতে আসে।ডাক শুনেই কেমন যেন উতলা হয়ে যায়।কিন্তু ওর মা যেতে দেয় না।কাবেরী সেদিন শ্রীবাসকে বলেছে,“বাবা,তোমার ডাক শুনলেই আর ও পড়তে পারে না। ”

এই বাড়ীতে ওদের কেউ বলতে ওই জোনাইই আছে।ছোট তো,কদ্দিন অমন থাকে সে বিষয়ে আক্ষেপ হয় অনিমার।মা যেমন, ছাও কেমন হবে।কিন্তু সে তো কোনোদিন তার ছেলেদেরকে খারাপ কিছু শেখায় নি।তাহলে তারা এমন হলো কেনো।অনিমার এ প্রশ্ন সরল সোজা শ্রীবাসকে করতে পারে না।সে জানে তার স্বামী, এই প্রশ্নের গভীরতা বোঝে না।

মানুষ একটু কম চিন্তা করলেই ভালো।অপমানের ঝামেলা থাকে না।কোনো অভিযোগ থাকে না কারো উপর।তবে রাগ জমে গেলে সে রাগ সহজে উঠে না।শ্রীবাস দুই ছেলেকে একেবারে সহ্য করতে পারে না।আরে বউ এনেছিস কি হয়েছে।তাই বলে নিজেদেরকে এভাবে ভেড়া করে ফেলিস কোন সাহসে রে।বউয়ের কথায় উঠাবসা।তোদের মানুষ করাই অন্যায় হয়েছে।

মদনের মা যখন মারা গেলো —পাড়ার মানুষের মদনের উপর,ওর বউয়ের উপর কি ঘৃণা।মা টা না খেতে পেয়ে মারা গেলো।সে কি কান্না ওদের।ফুপিয়ে ফুপিয়ে —যেন কোনো যক্ষের ধন হাতছাড়া হয়ে গেছে।তবে মার নামে যখন জমি ছিল তখন ওরা ভাইগুলো মাথায় তুলে রাখতো।যেই জমিটুকু লিখে

নেওয়া হল,সেইই শুরু হল দূর দূর করা।সে যেন হয়ে গেলো ঘরের আবর্জনা।পরিত্যাগ করবার নিমিত্তে যাকে রাখা হয়েছে।কিন্তু অন্যরা কি বলবে সে কথা ভেবে তা কোন জায়গায় ফেলা যাচ্ছে না।

এসব যখন হয় তখন অনিমার ছেলেরা ছোট।তারাও কত কিছু বলেছিল—মায়ের সাথে এমন দুর্ব্যাবহার কেউ করে?সেই সময় খনিকের জন্যে হলেও একটু মাথা চালানো অনিমার মনে এসেছিল,তারও দুটো ছেলে আছে।কিন্তু তখন তো পিন্টু-মিন্টু ছিলো মাটির মতো,মা বলতে পাগল।সেই সময় এই বয়সের দুঃখের নদীতে সাঁতার দেওয়া সম্ভব হয় নি।এখন তারাও সেই নদী পার হচ্ছে!সন্ধ্যা নামবে। কিন্তু এই সন্ধ্যা বেলায় যে মাঝিদের একান্ত দরকার, যারা একটু শক্ত করে হাল ধরে পারে পৌছে দেবে, তারাই এখন কোনো এক দ্রাক্ষার নেশায় বুদ হয়ে আছে, মহুয়ার গন্ধে তারা এখন দিশেহারা।

আগে বেশ বাপের বাড়ী যেত অনিমা।এখন ছেলেদের সাথে ঝামেলা হওয়ার পর আর যায় না।একবার গিয়েছিলো।ওদের সংসারেও সেই একই সংকট।দাদারা-বৌদিরা এখন শশুর-শাশুড়ী হয়েছে।শ্রীবাসের সংসারের অবস্থা প্রথম দিকে ভালো ছিল না।এক একবার যেতো আর কত কি নিয়ে আসতো।পাঁচটা ভাইয়ের একটা বোন ছিল।বেশ আদরের ছিল সে।তবে শ্রীবাসের সাথে ঘর করতে গিয়ে কত কিছু মানিয়ে নিতে হয়েছে।

সেই যখন বড় ঝড় হল, টালির ঘর তো ভেঙ্গে পড়ল।কোনো মতে ছেলেদের নিয়ে ঘর থেকে বেরোই।দাদারা ঘরামি নিয়ে এসে দুই তিন দিন থেকে আবার ঘরে তুলে দিয়ে যায়।কি প্রভাব তখন ওদের।এখন ওদের কথা কে শোনে?ছেলে বউয়েরা এসে যেন সব তাদের হয়ে গেছে?

বৌদি আসার সময় কত যত্ন করে ব্যাগ ভরে কত কিছু দিতো।এখন দেখি সেও কেমন যেনো ভয়ে ভয়ে থাকে।বলে,“অনি,কি বলবো, বোন,এখন যে আমরা বোঝা হয়ে গেছি। ”

আর অনিমা গেলেও যে সেই একই অবস্থা।ওই একবার জিজ্ঞেস করে,“পিসি,কেমন আছো? ”

তারপরে আর কোনো খোঁজ খবর নেয় না।ওখানে তিন দাদা থাকে।দুই দাদা মারা গেছে।ওই দাদাদের কথা ভেবে অনিমার চোখ ভিজে যায়।সুখের স্মৃতি গুলোও যে কখনো কখনো দুঃখের বারিধারা বইয়ে দিতে পারে অনিমার আচল তা স্বাক্ষর করে রেখে দেয়।নিজের যদি সুখ থাকে তাহলে অপরের দুঃখে সহানুভূতি জানানো যায়।পাশে বসে দুটো আশ্বাসবানী শোনানো যায়।নিজের অবস্থাই যদি হয় অপরের মতো, তবে তাদের মধ্যে যে কথপোকথন চলে তা খানিকটা এমনই হয়:

আচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অনিমা বলে,“কি বলব বৌ,আমার কী দাদা কী হয়ে গেছে?”

বৌদি বলে,“অনি,কাঁদিস না।এই তো আমাদের কপালে লেখা ছিল— ”

অনিমার মনে পড়ে যায় সেই যখন নতুন নতুন আসতো এখানে।বড় দাদা, মেজ দাদা বেঁচে ছিল।পুকুর থেকে মাছ ধরতো।বৌদিরা মিলে তা কাটতো।কী একটা ভালো সময় ছিল।

“বৌদি,বড় বউ -ছোট বউ কথা বলে না।বউরা বলবে কি,পিন্টু-মিন্টুও একবার খবর নেয় না।রাত্রে খেলাম কি না খেলাম—একবারও দ্যাখে না।মনে হয়, মরে যাই। ”

—“তুই জানিস,বহুকালের অভ্যেস তোর দাদার —একটু সকাল-সকাল ভাত খাওয়া।এখন রান্না করতে করতে বেজে যায় বারোটা।বুড়ো মানুষ—ক'টা ভাতের দিকে চেয়ে থাকে,কখন ডাকবে।আমারে নিয়ে ভাবনা নাই রে,ওনার কথা ভাবলে।ঘুমের থেকে উঠে নয়টায়। ” বলতে বলতে অনিমার বৌদিও চোখ মোছে।আবার বলে,“তোর দাদার চশমাটার পাওয়ার কমে গেছে, অসীমকে কতবার বলল।কিন্তু এ কাজ ও কাজ ওর লেগেই আছে।বলে—সময় পাই না।চোখের ডাক্তার দেখিয়ে তারপর নিতে হবে। ” সময় যে ওদের কখন হবে তা ভেবে পায় না ওরা।হয়তো চোখে আধার নামতে নামতে এক সময় সব কিছুই আবছে হয়ে আসবে—তখন ওদের সময় হবে!

অনিমা থাকতে পারে না;বলে, “বৌদি আমাদের ওইখানে ভালো একটা

চোখের ডাক্তার আছে।তুমি দাদাকে নিয়ে চলো।আমি দেখিয়ে দেবো। ”

শ্রীবাসের ব্যাংকে টাকা আছে।অনিমার টাকা নিয়ে দুঃচিন্তা নেই।কিন্তু ও কোনো দিন দাদার সামনে ফ্রিলি কথা বলে নি।সব সময় একটা সন্মান দেখিয়ে চলতো।একটু ভয়ও পেতো।ছোট ছোট ভাইগুলোকে বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে বড় করে তুলেছে।ঠিক বাবার মতোই।সেই দাদা আজ টাকার অভাবে চোখের ডাক্তার পর্যন্ত দেখাতে পারছে।খুব খারাপ লাগে অনিমার। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয়।এই বউদের এক একটাকে মনে হয় একদিন ধরে মারে।সেই মারার জোর একসময় অনিমার ছিল।যখন শ্রীবাসের সাথে মাঠে কাজ করতো।সকালে রান্না করে নিয়ে গিয়ে সেই দুপুর পর্যন্ত দুইজনে কত কাজ করতো জমিতে।ছেলেদের একটু লেখাপড়া শেখাবে বলে।কিন্তু লেখাপড়া তো শিখলোই না,আর এক একটা হয়েছে বৌকুণো।তবে অনিমার ভাইপোরা চাকরী করে।দালান ঘর।কিন্তু ঘর দেখে কি আর মন বোঝা যায়।মনের কার্যাবলী চলে ভিতরে।এই দালান ঘরে শুয়েও যে ওদের শান্তি নেই তা অনিমা বেশ জানে।এই বয়সে সুখটা বড় বেপরোয়া হয়।ধরা দিতে চায় না। কেউ বোঝে না—এদের আসলে শরীরটাতেই শুধু বয়সের ছাপ পড়েছে।মন তো রয়ে গেছে সেই লাল নীল যুবা বয়সের কাছাকাছি!

৬

বাপের বাড়ী থেকে ফিরে এসে অনিমার কেমন যেন ভালো লাগছে না।ভেবেছিল কয় দিন থাকবে।কিন্তু ওদের ওই অবস্থা দেখে মন দাড়ালো না।এখানে এখন তো ওদের কেউ কথা শোনায় না।যে জন্য কথা শোনাতো,সেই নির্ভরশীলতার বন্ধন ওরা ছিড়ে দিয়ে এখন কষ্টে-দুঃখে ভালোই আছে।অথচ আগে ওরা ভাবতো,ওরাই মনে হয় সবচেয়ে খারাপ আছে।এমনই তো হয়,অধিকাংশ সময় আমরা ভাবি পৃথিবীতে আমরাই বোধহয় সবচেয়ে দুঃখী,কিন্তু আমাদের থেকেও যে কারো অবস্থা খারাপ হতে পারে তা ভেবে দেখি না।তখনই আমাদের চোখ ফোটে যখন আমাদের চেয়ে দুঃখী কেউ আমাদের সামনে এসে দাড়ায়।সেই যে একটা কবিতার মতো—

একদা ছিল না 'জুতো' চরণ-যুগলে

দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে।

ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে,

গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে !

দেখি তথা এক জন, পদ নাহি তার,

অমনি 'জুতো'র খেদ ঘুচিল আমার,

পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন

নিজের অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ ?

সত্যিই দাদার সেই চশমা পরা মুখটা বারবার মনে পড়ছে অনিমার।সেই ছোট থেকেই দাদাকে দেখে এসছে চশমাচোখে।কিন্তু এই জীবন সায়াহ্নে এসে এমন অবস্থা হবে ভাবতে ভাবতে আরো একবার চোখের কিনারে অশ্রু জমে আসে।কিন্তু তারও তো সেই অবস্থা।শ্রীবাসকে বলাতে ও তো বলে," বৌদিকে

ফোন করে দাদাকে নিয়ে আসতে বলো। এখানে বঙ্কিম ডাক্তার খুব ভালো চোখ দেখেন।”

কিন্তু ফোন ওদের নেই।কিভাবে করবে?নিজের ছেলেদের ফোন আছে কত গুলো। তা রেখে পাড়ার কার কাছে যাবে।অনিমা আসার সময় নাম্বারটা লিখে নিয়ে এসছে।যদিও আগে এনেছিল।কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল তা।

মিন্টু বাড়ীতে ছিল,কাগজটা হাতে নিয়ে শ্রীবাস যায় ওর ঘরের দিকে।ঘর থেকে হাসাহাসির শব্দ আসছে।ডাকে,“মিন্টু —”প্রথমত ওরা হয়তো আশাই করতে পারে নি বাবা এসে এভাবে ডাকবে।মিন্টু পরে বোঝে ওর বাবাই।এ কন্ঠস্বর তো অনেক দিনের পুরোনো।এই কন্ঠের সাথেই তো ও বেড়ে উঠেছে।এখন হয়তো নতুন কন্ঠেই ও খুজে নেয় আনন্দ। অথচ যখন হাট থেকে বাড়ি ফিরে শ্রীবাস ডাকতো,“মিন্টু.......” কি এক মাধুর্য ছিল সে ডাকে।অথচ এখন সেই ডাক কার ডাক বলে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বুঝে অনুমান করে বলে,“কি হয়েছে বাবা?”

ঘর থেকেই বলছিল মিন্টু।শ্রীবাস ওদের ঘরে ওঠে নি এখনো কোনোদিন। আজও ওঠে নি।বাইরে দাড়িয়ে ছিল।ছোট বউ বলে,“বাইরে গিয়ে কথা বলো না,যাও—কি বলে দ্যাখো।”

শ্রীবাস বাইরে থেকেই শোনে ছোট বউয়ের কথা।তাতে কর্ণপাত করে নি এমন ভাব নিয়ে বলে,“তোর বড় মামার নম্বর,একটু ফোন কর তো।এখানে একটু আসতে বলতে হবে।”

ঘর থেকে হাত বাড়িয়ে নম্বর লেখা কাগজটি নেয় মিন্টু।মোবাইল ঘরে রয়েছে।কাগজটি নিয়ে ঘরে যায়। তন্দ্রা একটু ধীরে ধীরে বলে,“তা বাবাকে বসতে বলো— ”

মোবাইলটি নিয়ে এসে বলে,“বাবা,উঠে বসো—”

নতুন ঘর করেছে অনেকদিন হল।একবারের জন্যও বলে নি।কত অনুষ্ঠান করল।শশুড়বাড়ীর, পাড়ার কত লোক এলো—শ্রীবাস-অনিমা সেদিকে ফিরেও চাই নি।আজকে বাধ্য হয়ে এসেছে বলে বসতে বলছে।মোবাইল

ব্যাপারটা এখনো শ্রীবাসের কাছে দুর্বোধ্য। খানিকটা অবাক করা কিছু।যদিও এখন জনে জনে আছে।কিন্তু সে তো তা চালাতে পারে না।তাই যে চালায় , তাকে একটু সমীহ করা উচিত।তাছাড়া ফোন করাটাও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমে ফোন করলে মামিই ধরে ফোন,“হ্যালো মামি,আমি মিন্টু—কেমন আছো?”

—“আছি। বাবা ভালো আছি।তোরা কেমন আছিস?তন্দ্রা কেমন আছে?”

তন্দ্রা মিন্টুর বউ।তবে এ বাড়ীর কোনো আত্নীয়র সাথে ফোনে কথা বলতে ওর একেবারে অনিহা।এ নিয়ে মিন্টুর সাথে ঝামেলা বাধে।তাইই কোনো আত্নীয়র সাথে কথা বলবার সময় মাথায় রাখে,যেন তন্দ্রার প্রসঙ্গ না আসে।আর এলেও যেন হালকা ভাবে কাটানো যায়।কিন্তু তন্দ্রা ওর বাপের বাড়ীর সবার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বললেও ক্লান্তি আসে না।মাঝে মাঝে মিন্টুকেও কথা বলতে হয়।

মিন্টু বলে,“ হ্যাঁ, মামি, ভালো আছে।শুয়ে আছে।”

এটুকু বলতেই হবে।না হলে যদি বলে 'দে ওর কাছে একটু,একটু কথা বলি /শুনলাম নাতি-নাতনি আসবে'—তাহলেই মুসকিল।তাই আগে ভাগে যেন তা না বলে, এই কথা বলে সেই পথই পরিষ্কার করল।

“মামি,এই নাও বাবার সাথে কথা বলো—"

—"হ্যাঁ, দে—”

ফোনে একটু জোরে জোরেই কথা বলে শ্রীবাস।অনেক দূর থেকেই শোনা যায়—

“বড় বৌ, বড় দাদাকে নিয়ে কবে আসবে তাই বলো?দাদার চোখের অবস্থা কি এখন?”

বাবা অনেকক্ষণ কথা বলবে ভেবে,ঘরে চলে যায় মিন্টু।তন্দ্রা বলে,“এক মাইল দূর থেকেও শোনা যাবে—”এই সব জন্যেই তো ওর ভালো লাগে না।কিন্তু ভালো না লাগলেও শুনতে হবে এই শব্দ দূষণ।টিভির ভ্যলুমটা আরো বাড়িয়ে

দেয় তন্দ্রা।মিন্টু বলে,“সাউন্ডটা একটু কমাও না।বাবা তো কথা বলছে।” একটা রাগান্বিত ভাব দেখা দেয় মিন্টুর চোখে-মুখে।

তন্দ্রা বাধ্য হয়ে কমিয়ে দেয়।তবে ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে,ওর রাগ হয়ে গেছে।এমন রাগ তন্দ্রার অনেক বার হয়।একটু এরকম-ওরকম হলে তন্দ্রার মুখ ভার হয়ে আসে।সেই ভার মুখ কত অঙ্গভঙ্গি করে ভাঙ্গাতে হয় মিন্টুর।কিন্তু এভাবে কতদিন চলে।তাই ইদানীং মিন্টুও রেগে যাচ্ছে।তাতে করে একটা ভালো ফল হচ্ছে,মূহুর্তে মুহুর্তে রাগ দেখাবার সেই প্রবণতা একটু কমেছে।

কথা বন্ধ হয়ে গেছে।শ্রীবাসের কথায় মিন্টু বুঝতে পেরেছে,মামার চোখে কোনো সমস্যা। তাই এখানে আসার কথা বলছে বাবা।তবুও জিজ্ঞেস করে,“বড় মামার কি হয়েছে?”

—“চোখে ভালো করে দ্যাখে না।তাই বললাম,এখানে আসতে। বঙ্কিম ডাক্তারকে একবার দেখাবো।”

বঙ্কিম ডাক্তার চোখের হলেও একেবারে পাশ করা ডাক্তার না।তবে শ্রীবাসের কাছে ওনাকে অনেক বড় ডাক্তার মনে হয়।একবার মাঠের থেকে কি একটো পোকা যেন শ্রীবাসে চোখে ঢুকে যায়।সে কি যন্ত্রণা।ওনার কাছে গেলে, ওনি একটা ওষুধ দিলে এক রাত্রের মধ্যে চোখ পরিষ্কার হয়ে যায়।সেই থেকে বঙ্কিম ডাক্তারের পরে অনেক আস্থা শ্রীবাসের।সেই জন্য বলেছিল।

মিন্টু বলে,“ তার থেকে মামাদের ওখানে তো ভালো ডাক্তার আছে?”

—“অনেক দিন আসে না তো।তাই একটু বেড়িয়েও যাবে।আর একটু দেখিয়ে দেবো।দেখালে তো ক্ষতি নেই।”এখানে আসল কারণটি শ্রীবাসের বলবার কথা ছিল। কিন্তু বলে না।বললে তো ছেলের গায়েই লাগবে। বললে বলতে হতো,“

ওরাও তোদের মতো। তোর মামা-মামিকে এখন ওদের প্রয়োজন নেই।”

৭

এভাবে চলে যায় ওদের দুজনের। কত ছোটখাটো ঘটনা ঘটে যায় জীবনে।স্বপ্ন যা ছিল,তা অতীত হয়েছে বহু আগে।দুটো স্বপ্ন ছিল—পিন্টু আর মিন্টু।এখন তারা কাছে থেকেও মনের সীমান্ত থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।মাঝে মাঝে শ্রীবাসের কাছে টাকা থাকে না।একেবারে শূন্য পকেটে চলে।ব্যাংক থেকে সব সময় টাকা তোলাও যায় না।সেই সময়টা অনিমা বুঝতে পারে বাজারের ধরণ দেখে।আলু এক কেজির জায়গা পাঁচশ গ্রাম।একটু স্বস্তা-স্বস্তা তরকারি যা একেবারে ভালো পছন্দ করে না শ্রীবাস তাইই আনতে হয়।তবে একটা দুটো জন দিয়ে আবার টাকা হাতে এসে যায়।মনের সুখে বাজার করে।দুজনের বাজার।অনিমা রান্না করবে।আর সে খাবে।কিন্তু একটা প্রশ্ন শ্রীবাসের মনে আসে,অনিমাকে বলে না,“সে যদি মারা যায় তাহলে অনিমার কি হবে?”

আপাতত মৃত্যুর কোনো আভাস শ্রীবাস পায় না।তবে শীত এলে ভয় হয় একটু।এই যে এবার শীতের প্রকোপটা যেন একটু বেশি।হাড় হিম করা হাওয়া।সারারাত টিনের পরে বৃষ্টির মতো শিশির পড়ে।বাজার থেকে বেশি রাত করে না এখন আর।বেশি ঠান্ডা লাগলে শ্রীবাসের হাপানি টা বেড়ে যায়।শ্রীবাসের মনে হয়,ওর এই রোগটা বংশগত।বাবার ছিল।বাবার থেকেই ওর হয়েছে।ডাক্তার একবার দেখিয়েছিল—কি একটা নাকের মধ্যে দিয়ে টানতে বলেছিল।তা একেবারে ভালো লাগে না।

বড় বউয়ের মা এসেছে।একটা বাটিতে মিষ্টি নিয়ে এসে অনিমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে জোনাই বলে,“ঠাম্মা খাও।দিদা এসছে; এনেছে।” ওর দিদা অনেক কিছু আনে।শুধু মিষ্টি না।খেতে বসে শ্রীবাসের পাতেও দুটো দেয়।“আগে ওনি এলে একবার আসতো,এখন আসে না।কেন কে জানে?”প্রশ্নটা মনের মধ্যে পাক খেতে খেতে মিষ্টি গলা বেয়ে নিচে নেমে যায়।একটা ক্ষোভ জন্ম নেয় ওনার উপর।ভাবে, মিষ্টিগুলো না খেলেই ভালো হতো।কিন্তু খেয়ে তো নিয়েছে।তবে মনে মনে এটা ভেবে রেখেছে, আর কোনোদিন খাবে না।

শ্রীবাস মদ খেয়ে এলে অনিমা বুঝতে পারে।রেগে ফেটে পড়ে না।অনিমা ধীর স্থির।এই যে এক সাথে এতটা বছর কাটিয়েছে কখনো তাড়াহুড়ো ওর স্বভাবে নেই।তবে স্বামী তার এতটা খারাপ ছিল না আগে।কিন্তু এখন যেন বললে আর শোনে না।বড়জোড় দুই তিন দিন।তারপরে যা তাই হয়ে যায় –ওর রাত।তবে সব দিন যে খেয়ে আসে তা নয়।যেদিন খেয়ে আসে না সেদিনও বোঝা যায়।

আজ খেয়ে এসেছে।বলে,"হুকো খেতাম।সেটাও বাদ দিয়েছি।ওদের জ্বলে যায়।না খেলাম না তোর হুকো।"ঘর থেকে ওটা টেনে বের করে পিন্টুর ঘরের দিকে ছুড়ে দেয় শ্রীবাস।তখন বেশ রাত।সব ঘর থেকে টি.ভির শব্দ ভেসে আসছে।কত কাহিনী হচ্ছে। কিন্তু এদের জীবনের যে কী কাহিনী হচ্ছে তা বুঝে ওঠা একটু মুসকিল।

ভোর রাত্রে অনিমার ঘুম ভাঙ্গে।উঠে,হুকোটা এনে রেখে দেয়।তেমন একটা কিছু হয়নি।শুধু উপরের পাথরের কল্কিটা একটু দূরে পড়ে ছিল।তখনও আবছা অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল, তামাক আর নারকেলের ছোবড়া পড়া ছাই কিছুটা পড়ে আছে।তবে তা নিয়ে না ভেবে ওটা এনে বাধিয়ে রাখে।

প্রতিদিন ভোর বেলায় গোবরের ছড়া দেওয়ার অভ্যেস অনিমার।সবাই আলাদা ঘরে থাকলেও উঠোন এক।তাই আলাদা হবার পরও কিছুদিন গোবরের ছড়া দিয়েছে উঠোনে।কিন্তু তাতে যত আপত্তি বড়বৌয়ের।ছেলেকে দিয়ে বলিয়েছে,"মা, আমাদের এই দিকটায় গোবর দিয়ে ছড়া দেওয়ার দরকার নেই।ভোরে জোনাই ঘুমোতে পারে না।ওর গন্ধে।"

কিন্তু অনিমা জানতো গোবর ছড়া দিলে বাড়ীর আশপাশ বেশ পরিষ্কার হয়।তবে ছেলেকে কিছু বলে না।এখন ওদের ঘরের সামনে টুকুতেই দেয়।তাতেও ওদের আপত্তি।ও গন্ধ ঠিকই ওদের ঘরে ঢুকে যায়।ওদের জাগিয়ে তুলতে চায়।কত আর ঘুমোবে তারা।ওই তো সূর্য তার আভা নিয়ে উদিত হচ্ছে।কতদিন কাবেরী রেগে গিয়ে বলেছে,"ধ্যেত, এ বাড়ীতে আর থাকা যায় না–মেয়েটাকে একটু ঠিকভাবে ঘুমোতেও দেবে না।"

অনিমা বোঝে এতে বড় বউয়ের রাগ হয়।তবে ওর কিছু করার নেই।এত দিন

ধরে করে এসেছে। ছেলেরা তার ঘুমিয়েছে।এখন হঠাৎ বউ এসে কি হল—যত সব বাহানা।তাই কোনো কথা ভেবে অনিমা থেমে যায় না।সব চেয়ে বড় কথা—ওরা তো এখন আর ওদের কারো মুখাপেক্ষী না।যখন কিছু করতে পারবে না, তখন কী হবে—সেই কথা মাথায় এলেও ও নিয়ে বেশি একটা ভাবতে চায় না।আর তা ভাবতেও পারে না।

৮

শ্রীবাস কোথা থেকে যেন একটা মাটির পাত্র নিয়ে এসেছে।খেজুরের রসে ভরা। শীতের সকাল। বাড়ীর পূর্ব দিকটায় সবাই বসে।আগে ওখানে শ্রীবাসও বসতো।বসে বসে কত কি কাজ করতো।এখন ওখানে ছেলে-বউয়েরা বসে।ওদের দুই ভাইয়ের মধ্যেও সম্পর্ক তেমন ভালো না।নিছক প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না।অথচ এক সময়, কী গলায় গলায় ভাব ছিল দু'ভাইয়ের।দুইজন একজায়গায় শুয়ে ঘুমোত।বয়েসের খুব একটা ছোট-বড় না ওরা।ওদের মাঝে একটা মেয়ে হয়েছিল শ্রীবাস আর অনিমার। সে বেশি দিন বেঁচে ছিলো না।

শ্রীবাস তখন মদ খেতো না।ওই দুই একদিন অনুষ্ঠান বাড়ীতে যদি খেতো।কিন্তু মেয়েটা যখন মারা গেলো—নিজেকে আর সামলাতে পারে নি।এই মদ খেয়েই কিছু সময়ের জন্য দুঃখ ভুলে থাকে।

এখনো যখন প্রলাপ বকে, বলে,“মেয়েটা আমার থাকলে এতোদিন বিয়ে দিতাম।কোথাও ঠাই না পেলে তার কাছে তো পেতাম।”

তবে এখন মদ খাওয়ার আরো আরো কত কারণ অনিমার সামনে হাজির করে।শীতের সময় বলে,“গা টা বেশ গরম থাকে।” গরমে বলে,“ হজমটা ভালো হয়।”

অনিমা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।তবে আশে-পাশের কত সংসার ভেঙ্গে যেতে দেখেছে।মনে মনে আফসোস করেছে।কিন্তু এখন যে তার ছোট সংসারেও সেই ভাঙ্গণের আভাস পাচ্ছে।কিন্তু কত নিষেধ করবে শ্রীবাসকে।তাছাড়া, যখন ঘুমোই তখন বুকের থেকে একটা কেমন শব্দ এসে অনিমার ঘুমে মিশে যায়।এটা অনেক দিনের পুরোনো।দীর্ঘ এই যাত্রায় এই শব্দ ওর খুব চেনা।মনে মনে ভাবে—এই শব্দ একদিন যদি থেমে যায়।সেই জন্য বারবার বলে,"তুমি মদটা ছাড়ো একটু....."বলতে বলতে ক্লান্তি এসে গেছে ওর।

"জোনাই শুনে যা।",বলে ডাকে শ্রীবাস।তখন জোনাই রোদে বসে পড়ছিল।ওইটুকুন বাচ্চা মেয়েকে কী শাসনে বড় করে যে!তা দেখলে শ্রীবাসের কষ্ট লাগে!কিছু বলে না।ওর ছোট্ট মনটাকে একটু অনুভব করার চেষ্টা করে শুধু।তাছাড়া ঠাম্মা-ঠাকুরদার প্রতি ওরই একটা টান আছে।ওর মা যতোই দূর দূর করুক।শ্রীবাস একে রক্তের টান হিসেবে দেখে।

দৌড়ে আসে জোনাই।শ্রীবাস বলে,"খেজুর রস।কেবল পাড়া।যা গ্লাস নিয়ে আয়—"

মেয়েকে যখন তখন যা কিছু এভাবে খেতে দেওয়াতে কাবেরীর আপত্তি আছে।কতবার বলেছেও সে কথা শ্রীবাসকে। কিন্তু কোনো কথাই যেন ততটা গুরুত্বের সাথে নিতে পারে না সে।আবার মুখের পরে ফিরিয়েও দেওয়া যায় না।জোনাই আবার দৌড়ে গিয়ে মাকে বলে,"মা রস রস, ঠাকুর দা এনেছে।একটা গ্লাস দাও।"

জোনাই বলবার আগেই বুঝেছে সে কথা।জোনাই এখানে যখনই আসুক না কেন কাবেরীর কান থাকে সারাক্ষণ।শ্রীবাস-অনিমা প্রায় নিরক্ষর বললে চলে।তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু শিখবে বলে কাবেরীর মনে হয় না।তাই জোনাইকে যতটা পারে ওদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে।তাই যদি না করতো তাহলে এতো দিন কি জোনাইয়ের ভাষা শোনা যেত—কথায় কথায় খিস্তি থাকতো।শ্রীবাস আর অনিমা কত গালাগালি দেয়।এমন অনেক গালাগালি কাবেরী তা-ই নতুন শুনেছে।মেয়েকে জেনে বুঝে এমন

অশিক্ষিতদের কাছে দেবার কোনো মানে নেই।তবুও চলে যায়।কত আর চোখে চোখে রাখা যায়।তাই গেলেও তাড়াতাড়ি নিয়ে আসে।

কাবেরীর ইচ্ছে ছিল ওর বাপের বাড়ীর ওইদিকটায় জমি কিনে বাড়ি করার।মিন্টুকে বলেছেও কয়দিন।কিন্তু ওর তাতে ইচ্ছে নেই।এ নিয়ে বেশ কয়েকবার কথা কাটাকাটিও হয়েছে।

“এখানে থাকলে মেয়েকে মানুষ করা হবে না।তোমাকে কতবার বলেছি,চলো ওইদিকটায় যাই—”

কাবেরীর কাছে ওইদিকটা মানে ওর বাপের বাড়ীর দেশ।সব মেয়ের কাছে ওর বাপের বাড়ীর দেশের তুলনা হয় না।তাই যদি একটু সুযোগ পায় তো,ওখানে থাকার, সেই হিসেবে বলে কাবেরী।তবে পিন্টু কাবেরীর সব কথায় সায় দেয় না।

“ওখানে গেলে খাবো কি?এখানে একটা দোকান অন্তত চলে?ওখানে কে চেনে আমাকে?”

—"তুমি এখানে দোকান দিও তাহলে।বাইকে চলে আসবে?”

মনে মনে চটে যায় পিন্টু।বলে,“ তা এখানে থাকলে সমস্যা কোথায়?তোমার যদি ভালো না লাগে তাহলে চলে যাও।”

তারপর এ নিয়ে আর তেমন কোনো কথা হয় নি ওদের মাঝে।যে মেয়ের এই এলাকাই ভালো লাগে না,সে কিভাবে অন্যের মা বাবাকে আপন করে নিতে পারবে?

৯

মাঝরাত্রে অনিমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো।প্রথমে দেখে শ্রীবাস অঘোরে ঘুমোচ্ছে।সে একটা স্বপ্ন দেখে স্থির থাকতে পারছে না আর;একেবারে যেন চোখের সামনে দেখল সে—জোনাই যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। আর ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।আর স্বপ্নটি এমন যে তা অনিমার কাছে খানিকক্ষণ একেবারে সত্য বলে মনে হয়েছে।এখন ওর বুক ধড়-পড় করে কাঁপছে।গলা শুকিয়ে গেছে।সেই শুকনো গলায় শ্রীবাসকে ডাকে,“ও পিন্টুর বাপ,একটু ওঠো তো।”শ্রীবাসের গাঢ় ঘুমে এমন কতবার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে অনিমা।আর প্রতিবারেই দেখা যায়,রাত্রে অনিমার কোনো একটা অবান্তর ভয়ের জন্য—এমন করে অনিমা।প্রতিবারেই শ্রীবাস বলে,“তোমার মনের ভয়।”একদিন তো শ্রীবাসকে নিয়ে কী একটা স্বপ্ন দেখে ওকে জাগিয়ে, তারপর ঠিক হয়।

এক ডাকে শ্রীবাস উঠবে না তা জানে অনিমা।তাই গায়ে হাত রেখে আবার ডাকে।এবার সাড়া পাওয়া যায়।তবে আড়ষ্ট কথায় আর ঘুমের মধ্যেই বলে,“কি হল,ডাকছো কেন?”

“আমি যে জোনাইকে নিয়ে কেমন একটা স্বপ্নে দেখলাম।” এই সময় শ্রীবাসকে একটু ভয় পায়।এসব স্বপ্নের সবই প্রায় খাটে না।শ্রীবাস অনিমার স্বপ্নের সেই ইতিহাস থেকে জানে।তাই এমন করলে এখন রেগে যায়।তবে আজকেও ডাকল। জোনাইয়ের মুখটা ভেসে ওঠে।একটা নাতনি তাদের।ওর হাসি আর ওই 'ঠাম্মা' 'ঠাম্মা' বলে এগিয়ে আসা কত ভালো লাগে।মাঝে মাঝে রান্নার সময় এলে, “ঠাম্মা,আমি রান্না করবো।" বলে একেবারে পাশে এসে বসে অনিমার।কখনো কোলের মধ্যে গিয়ে বসে।মা ডাকতেই কেমন যেন একটা ভয়ের দমকা হাওয়া ওর মনের চত্ত্বরে বয়ে যায়।হঠাৎ কেপে ওঠে।অনিমা বোঝে না,ছেলে মেয়ে তারাও বড় করেছে —কিন্তু কোনোদিন তো এমন ভয় দেখানোর দরকার পড়ে নি।মনে মনে, এই সান্ত্বনা দেয়,এখন যুগ পাল্টেছে তো!

সেই জোনাইকে নিয়ে এমন স্বপ্ন যেন কিছুতেই মানতে পারছে না অনিমা।বার-কয়েক জোনাই যে ঘরে ঘুমোয় ওই ঘরের দিকে তাকায়।জোৎস্না রাত।চাঁদের আলো এসে পড়েছে টিনের উপর।আর দিব্যি সব কিছু দেখা যাচ্ছে।কোথাও সাড়া শব্দ নেই।তবুও মন মানছে না।একবার ও ভালোভাবে ঘুমোচ্ছে, এটুকু দেখতে পারলে হতো!

এতক্ষণে শ্রীবাস আবার ঘুমিয়ে গেছে।আবার ডাকে সে।এবার উঠে।আবার বলে,"কি হয়েছে বলো?"

তখন বলেছিল অনিমা।কিন্তু ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারে নি। অনিমা বলে,"চলো না, ওকে একবার দেখে আসি।"

"কিছু হলে তো বোঝা যেতো।" শ্রীবাস উত্তর দেয়।কিন্তু এই উত্তর কানে গেলেও মনে যায় না।মন সায় দেয় না এমন কথায়।

অনিমা আর কতবার বলবে। এবার চুপ করে যায়।কিন্তু মনে মনে অনিমার জন্যে হয়তো একটু কেমন লাগে শ্রীবাসের।তাই উঠে পড়ে।জোৎস্না রাত বলে লাইট নিই নি।তা না হলে লাইট ছাড়া এক পাও বের হয় না সে।লাইটটি তার প্রিয় অনেক।

পিন্টুর ঘরের সামনে গিয়ে দাড়ায় ওরা।শীত যথেষ্ট। ইতিমধ্যে কুয়াশা পড়া শুরু হয়ে গেছে।শ্রীবাস ডাকে,"ও জোনাই,জোনাই।"

কাবেরী আগে জেগে ওঠে।বুঝতেও আরে এ তার শশুরের কন্ঠ।সে উঠে এসে দেখে শশুর-শাশুড়ী দুজন দাড়িয়ে।এই মাঝরাত্রে কি হয়েছে জানতে চাওয়ার আগে অনিমা বলে

"জোনা, ঘুমোচ্ছে তো?ওকে নিয়ে একটা স্বপ্নে দেখলাম—"

—"হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছে তো।কিছুই তো হয় নি।"

অনিমার ইচ্ছে ছিল ওকে একবার দেখুক এখন।কিন্তু এতো রাত্রে কাবেরীর সামনে সে প্রস্তাব রাখতে সক্ষম হল না।আর দুই একটা কথা বলে ওরা চলে আসে।

রাত যেটুকু বাকী আছে,আর ঘুম আসবে না অনিমার।তাছাড়া,এমনিতেই ভোর রাত্রে উঠে পড়ে সে।আর জোনাইকে নিজে চোখে না দেখা পর্যন্ত তার চিন্তাই যাবে না।

ইতিমধ্যে শ্রীবাস আবার ঘুমিয়ে গেলো।ওর নাক ডাকার শব্দ এসছে।কাবেরীও ঘুমোতে যায়।লাইট মৃদু একটা লাইট সব সময় জ্বালানোই থাকে।ও লাইটে জোনাইয়ের মুখ ভালোভাবে দেখা যায় না।তাই উজ্জ্বল আলোর ভাল্ব জ্বেলে আরেকবার দেখে নেয় জোনাইয়ের মুখ।

মেয়ে তার ঘুমোচ্ছে।ঘুমন্ত শিশুর প্রতি সত্যিই এক আলাদা দরদ কাজ করে।যত বকাঝকা করুক,যখন ওরা ঘুমিয়ে থাকে, তখন যেন একটা মমতায় ভরে যায় মায়ের মন,বাবার হৃদয়।

কাবেরী পাশে গিয়ে ঘুমোই ও।পিন্টু জেগে গিয়েছিল তখনই।বিছানা ছেড়ে ওঠে নি।তবে এতক্ষণ যা হল,সব শুনেছে।

কাবেরী বলে,“ জোনাইকে নিয়ে এক স্বপ্নে দেখেছে তাই—”

"ও,,,,, " পিন্টু কাবেরীর সামনে মা-বাবাকে নিয়ে তেমন কিছু বলে না।সে জানে মা বাবা তার খারাপ না।এই যে এটুকু টান যদি না থাকবে, তাই মাঝ রাত্রে কেন তারা ছুটে আসবে।কিন্তু কাবেরীকে ও ভয় পায়।ওর ভয়ে মা বাবার সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না।কাবেরী জোনাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

এখনো রাত বাকী আছে।ঘুমও পুরো হয় নি।তাই কথা বলতে বলে আবার ঘুমিয়ে যায় ওরা।জোনাইকে নিয়ে যে এত কিছু হল,তা জোনাই জানলো না;সে তো নবাগত প্রাণ।এখনো এই সংসারের দ্বন্দ্ব গুলো তাকে স্পর্শ করে নি।তাই ওকে সবাই ভালোবাসে।

১০

অনিমা সকাল পর্যন্ত একটা বিষয় ভেবেছে শুধু।তখন জোনাই ছোটো।কি একটা অসুখ হল ওর।গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।দুইদিন হাসপাতালে থাকতেও হয়েছিল।অনিমা বাড়িতে থেকে শুধু হা হুতাশ করেছে।তখন মনে মনে মানত করেছিল,"আমার জোনা সেরে এলে ওর নামে কালী পূজো দেবো।"

জোনা সেরে এসেছে ঠিকই।কতদিন হয়েও গেলো।হাসপাতাল থেকে ওরা ফিরে এলে, মানত করার কথা বলেছিল অনিমা।কিন্তু ছেলে-বৌয়ের মধ্যে তেমন কোনো একটা আগ্রহ দেখে নি।এখন তো ভুলেই গেছে।কিন্তু অনিমার মনে আছে।জোনাইকে দেখলেই ওর মনে পড়ে,ওর পূজোটা এখনো দেওয়া হয় নি।সারাক্ষণ একটা কেমন বিপদের ছায়া দেখে।সে কথা কাউকে বলে না।

সকালে শ্রীবাস উঠলে বলে,"জোনাইয়ের মানসীটা দেওয়া হল না। শুধু শুধু কি আমি অমন স্বপ্ন দেখি?"

শ্রীবাসও সায় দেয় ওর কথায়।মাঝে একবার মনে করিয়েছিল,কিন্তু তখন টাকার অজুহাত দেয়।অনিমা মনে মনে ভেবে রেখেছে ;যদি পিন্টু টাকা না থাকার কথা বলে তাহলে বলবে,"আমরা দেবো টাকা।"

সত্যিই শ্রীবাস দিলো টাকা।পাড়ার কত লোককে নিমন্ত্রণ করা।প্রতিমা বায়না দেওয়া।কত কাজ করেছে শ্রীবাস।অমাবস্যার রাত্রে কিছুই খাই অনিমা।জোনাইয়ের মঙ্গলের জন্যে একেবারে উপোস থেকেছে সে।শেষ রাত্রের দিকে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে এসেই তবে ওর মনটা শান্ত হয়েছে।এতদিন ধরে মনের মধ্যে খুত খুত করছিল। এখন অনিমার মন যেন কোনো একটা যুদ্ধ জয়ের আনন্দ পেলো।কিন্তু জোনাইয়ের মা-বাবা পেলো কি না তা ভাববার বিষয়।কেননা তারা তো এই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করে নি।

ছোট বউ একবার এসে পূজার আসনে নমস্কার দিয়ে চলে গেলো আর এলো

না।আজকে কাবেরী শাশুড়ীর সাথে মিশে গেছে যেন।মেয়ের মঙ্গলের জন্য শশুর-শাশুড়ীর এই ত্যাগ হয়তো তার মনটিকেও একটু বিগলিত করেছে।সেও আজ সারাদিন উপোস আছে।চোখ তার একেবারে কঠোরে ডুবে গেছে। একবার অনিমা বলেছে,“বৌমা, তুমি কিছু খেয়ে নাও।আমি তো উপোস আছি।”কিন্তু কাবেরী খায় নি।ওর মাতৃত্বও যেন জেগে উঠেছে।পুরোহিত যখন মন্ত্র পড়ছেন,তখন ওই সংস্কৃত উচ্চারণ বুঝবার ক্ষমতা ওদের নেই।অনিমা খুব ভক্তিভরে তা মনে মনে বলে যাচ্ছে।কিন্তু কাবেরী ভাবছে অন্যকথা,“শশুর-শাশুড়ীকে আর আলাদা রেখে খাবে না।সকালেই বলবে ওদের,যে,তোমরা আর আলাদা খাবে না।আমাদের সাথে খাবে।”ভাবতেই যেন ওর ভালো লাগল।আজকে ওর মনে কোনো হিংসার আভাসমাত্র নেই।

মানুষে মানুষে শত্রুতা দেখে মানুষের অদ্ভুত একটা আনন্দ হয়।পাড়ায় যখন ঝগড়া বাধে কিছু মানুষ সেই ঝগড়া শোনে;কিন্তু তা মিটাবার কোনো প্রয়োজনীয়তাই বোধ করে না।বরং সেই তাদের আলাপন কান পেতে শোনে।একটা উত্তেজনায় ভরা থাকে তা।আবার কিছু মানুষ আছে, যারা দুই পরিবারের মধুর ভাব মোটেও মেনে নিতে পারে না।ভাবে, এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেই যেন ভালো।ঠিক যেমন ছোট বউ তন্দ্রা।ওর হিংসা হচ্ছে কাবেরী তা বুঝতে পারে।তবে আজ কাবেরী, এও বুঝতে পারছে, এতোদিন ধরে সে তার শশুর-শাশুড়ীকে যেভাবে দেখে এসছে আসলে তারা অমন নয়।

বেশিরভাগ শশুর-শাশুড়ী ছেলে বউয়ের কাছ থেকে একটু মেয়ের মতো ব্যবহার আশা করে।কিন্তু পায় ক'জনে।শ্রীবাস -অনিমাও একদিন তাই আশা করেছিল।কিন্তু সেই আশা কবেই উড়ে গেছে বাষ্পের মতো।

জোনাইটা সেই সকাল থেকে বলেছে, আজ রাত জাগবে।কিন্তু বেচারা আজকেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে।অন্যদিন দিনের বেলা একটু ঘুমোয়।আজকে দৌড়-ঝাপ করেছে।সন্ধ্যের পরপরই ঘুমিয়ে গেছে।

পুরোহিত বলল,“ওকে ডাকো।”

কাবেরী উঠে গিয়ে ওকে কোলে করে নিয়ে আসে।কোলের মধ্যেই

ঘুমোচ্ছিল।অনেকে ডাকাডাকি করতে চোখ মেলল।কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল,ওকে বসিয়ে রাখা সম্ভব নয়।তাই ওর কার্যাবলী ছোটখাটো করে দিলেন তিনি।

এসব তারা করতেই পারেন।মন্ত্রের শর্টকাটও আছে।তবে এসব জায়গায় পুরোহিতগিরি করার একটা সুবিধে হল,এরা মন্ত্রের মানে বোঝে না।আর বুঝলেও তিনি যা বলবেন সব মেনে নেবেন। সেদিন ফর্দ দেখে দেখে কত বাজার করেছে শ্রীবাস।তবে নাতনির জন্যে কিছু একটা করতে পারছে এই ছিলো তার আনন্দ।

পাশেই প্যান্ডেল করে চেয়ার টেবিল সাজিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।পাড়ার কত লোক আসছে।শ্রীবাস যেন সত্যিই এতদিন পরে একটা আলাদা আনন্দ পাচ্ছে। এসব তার আয়োজন—ভাবতেই তার ভালো লাগছে।আজকে পিন্টুও যেন কত ভালোভাবে কথা বলছে ওর সাথে।প্রতিদিন যদি এমন হতো কী ভালোই না হতো।

১১

কালী পূজোর প্রায় সব খরচ যে বাবা-মা দিয়েছে তা ছোটছেলে মিন্টু বেশ বুঝেছেও।হঠাৎ করে,কেমন যেন বড় ছেলে- বড় বউ ভালো হয়ে গেছে ওদের কাছে।তবে এখনো আলাদা খায়।আলাদা খেলেও ওরা যে অনেকটা মিশে গেছে তা মিন্টু আর তন্দ্রার বুঝতে বাকী থাকে না।

"ওরা যে বাবা-মার সাথে এত খাতির জমাচ্ছে,এর কারণ আমার বোঝা হয়ে গেছে?"

তন্দ্রাও বুঝেছে ব্যপারটা, এটা তো সে অনেকদিন আগে থেকেই ভেবে রেখেছে,এমন একটা ব্যাপার ঘটবে,বলে," ও আমি আগের থেকেই তো তোমাকে বলেছি।"

সেদিন মিন্টুকে বলেছিল সে," বাবা-মা কে দেখো ওরা কাছে টানতে চাইবে।জমিটুকু আছে না?"

ব্যাপারটা যে সেই দিকেই যাচ্ছে,ভাবতেই মিন্টুর রাগের পারদটা যেন চড়ে যায়।

"পূজো করল।এত টাকা কোথা থেকে আসে?আর আমি ঘর করতে কয়টা টাকা চেয়েছিলাম।একটা কানাকড়িও দিলো না।" কথা গুলোবেশ জোরে জোরে বলে মিন্টু।যেন দুই ঘরেই পৌছে যায়।তন্দ্রা একটু ধীরে ধীরে বলতে বলে।

"কিসের ধীরে বলবো?আমি কি বানের জলে ভেসে এসছি?"

সকালের রান্না করছিল অনিমা।শ্রীবাস বাড়ীতে নেই।মিন্টুর কথা সব শোনা যাচ্ছে।ভাগাভাগির পর ঘরগুলো অনেক কাছাকাছি হলেও, মনগুলো অনেক দূরে চলে গেছে।অনিমার আর থাকতে পারে না।বেরিয়ে এসে বলে,"আমরা কি করেছি তোর?তোর ভাইজিটার মানসী ছিল তাই দিয়েছি।আর মানসী তো আমিই করেছি।"

আবার বলে মিন্টু,“ তা দিয়েছো,তাতে কিছু বলেছি। কিন্তু আমার ঘর করার বেলায়?”

—“তুই অত সুন্দর জমি টুক বেঁচে ঘর করেছিস।তোর কি একেবারে থাকার জায়গা ছিল না?তোর বাবার রাগ তো এই জন্য তোর পরে।” বেশ উচু গলায় বলে অনিমা।যেন শুনতে পায় সবাই।

ঝগড়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার।মনের কথা জমানো কথা বেরিয়ে আসে অনায়াসে।ঘরে দাড়িয়ে কাবেরীও সব শুনছিল, পিন্টু বাড়ী নেই।তাই কিছু বলার সাহস সে পাচ্ছে না।না হলে, তারও কিছু বলার ছিল,“আমরা কি মানসী দিতে চেয়েছি এখন,বলেছি পরে একদিন সময় করে দিয়ে দিবো।তা ওনারা যেভাবে উঠে পড়ে লাগলো।”তবে এ কথা বলে না কাবেরী।শুধু শুনে রাখে সব।

রাতের বেলা।শ্রীবাস তখন খেতে বসেছে।মিন্টু এসে বলে,“বাবা, আমি বাইরে যাবো।টিকিট মিকিট কাটতে হবে।কিছু টাকা দাও।”

আজকে যে কী হয়েছে তা সকালে এসেছেই জেনেছে শ্রীবাস।তবে কিছু বলে নি।আর তারা ভাবতে পারে নি,এভাবে মিন্টু এসে টাকা চাইবে।

“তুই এখন বাইরে যাবি কেন?তোর বউয়ের এই অবস্থা?”শ্রীবাস ভাত মুখে দিতে দিতে বলে।অনিমা তখন উনুনের সামনে বসে।

—“টাকা পয়সা নেই কাছে।কী করবো?”

কোনো কাজ করতে পরামর্শ দিতে পারতো শ্রীবাস।কিন্তু মিন্টু এখন তত ছোট না।সব বোঝে।তাই বলে,“ এখন টাকা তো নেই কাছে।পূজোতে তো অনেক টাকাই লাগল—”

ব্যাংকে যে টাকা রাখা আছে তা ছেলে-বৌদের কারো অজানা নয়।কিন্তু সে টাকা থেকে এভাবে তুলে দিলে তো চলবে না।তাই বলে,“তুই কয়দিন পরে যাস।বৌমাকে এই অবস্থায় রেখে যাস না।”

রেগে যায় মিন্টু।“টাকা দিবে না বললে হয়,অত কথা কিসের?”

বলে রেগে মেগে চলে যায় মিন্টু।অনিমার মুখেও অনেক কথা এসে ফিরে গিয়েছে।কিন্তু কিছুই বলে নি।একটু পরে কাবেরী আসে।সাথে জোনাই।কি বলে গেল মিন্টু– জিজ্ঞেস করে।টাকা চাইতে এসছিল শুনে বুঝতে পারে কাবেরী,ওরা আসলে হিংসায় জ্বলছে।

১২

সামনের মাসে ভোট।বাজারে কেমন যেন একটা আলাদা উত্তেজনা মানুষের মধ্যে।বিশেষত, চায়ের দোকানে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। এটা যে এবার দেখছে, তা নয়, সেই কত কাল থেকে দেখে এসছে।এই সময়টাতে চাখানাগুলোই হয়ে যায় পার্টি অফিস।

অনিমা বলে দিয়েছে,“বাজারে যাবে যাও,কিন্তুক বেশি রাত করবে না।”

পিন্টু-মিন্টুর কথা আগে ভাবতো না আগে।এখন একটু ভাবতে হচ্ছে যেন।কত কী ভাবে।ভাবলে,ওর কিছু ভালো লাগে না।নেতারা উপরে থাকে,তারা মরে না।ভোটের সময় যে খুনোখুনি হয় আর এটাই যেন স্বাভাবিক –তা এখন একটা শিশু পর্যন্ত বুঝে গেছে।অনিমাও বোঝে।সেও কতবার কত লোকেরে ভোট দিয়েছে।

শ্রীবাস নির্ভেজাল মানুষ। অধীরের চায়ের দোকানে গিয়ে বসে ঠিকই।কিন্তু তেমন একটা কথা বলে না।বিশেষত, রাজনীতি বিষয়ে তার জানবার দরকার আছে–সেটা সে নিজেও মনে করে না।তবে একটা পরিবেশে থাকলে যে সেই পরিবেশ থেকে মানুষ অনেক খানি শিখে নেয়।শ্রীবাসও জেনে গেছে অনেকখানি।বুঝে গেছে নেতারা সব ধাপ্পাবাজ –এই কথাটা চা খানায় কারো সামনে বলে না।কার মনে কী আছে তা বোঝা মুশকিল।বিশেষত,এই ভোটের সময়ে।

অনিমাকে বলে সব,“ইচ্ছে করে ভোট দিতে আর যাবো না।ভোট তো কতবার দিলাম। কী পেলাম? কিছুই না।”

অনিমা বলে,“ ভোটের সময়ই নেতাদের পাওয়া যায় বাড়ীতে।অন্য সময় ওরা যেন সোনার হরিণ।"

–“আজ বাজারে শুনলাম পথ সভা হবে।মোটর বাইক আসছে দলে দলে।শুনে আমি উঠে চলে এলাম।অখিল বলল–কোথায় যাও।আমি

বললাম,গরুগুলো উঠোতে হবে। যাই।”

অখিলকে শ্রীবাস অনেকবার রং পাল্টাতে দেখেছে।একবার এক দলে যায় সে।কী যে লাভ তাতে।অনিমা বলে, “লাভ তো আছেই ;মেরে খেতে পারে।এই যে সরকারি ঘরগুলো আসে—।”

তখন ওরা ভাত খাচ্ছিল।হঠাৎ শোনে বাইকের শব্দ।এমন ভোটের আগে কত এসেছে।কত কাগজ দিয়ে গেছে।শ্রীবাসের ভোটের সময় একটু ভালো লাগে। অন্য সময় কেউ তেমন দাম না দিলেও ভোটের সময় ওর মূল্য বেড়ে যায়।যারা অন্য সময় কথা বলে না তারাও এসে বলে,“কাকা,ভোটটা দিও।”

কাউকে কিছু বলে না।সবাইকে বলে,"দেবো।"

ওদের সাথে মিন্টুও ছিল।“মিন্টু, তোর মা-বাবা কোথায়?”

মিন্টু নিয়ে আসে ওদের।যারা রাস্তা দিয়ে গেলে সবাই একটু সমীহ করে, সেই তারাই আজ শ্রীবাসের কাছে এসেছে।

“দাড়িয়ে কেন?তোমরা ঘরে উঠে বসো।” শ্রীবাস বলে।

—“না না কাকা,বলছি, আমাদের বিশ্বনাথ দাদা দাড়িয়েছে এবার। তোমাদের দুটো ভোট দিও।”

মুখে তখন ভাত শ্রীবাসের।মাথা নেড়ে 'হ্যা' বলে সে।ওরা একটু পরে চলে যায়।কিন্তু মিন্টুটাকে ওদের সাথে দেখে কেমন যেন ভয় হয়।এই যে ওরা,একটাও বেশি ভালো না।গুন্ডামিতে বেশ নাম আছে।তাদের সাথে মিন্টু।কিন্তু কি আর বলবে।

অনিমা এতোক্ষণ কিছু বলে নি।ওরা চলে গেলে বলে,“মিন্টুর এদের সাথে মেশার কি দরকার? তোর একটা ভোট, তুই দিবি?তা অত দলগিরির কি আছে?”

—“ছোট বৌয়ের ভোট মনে হয় বাপের বাড়ীতেই আছে।”জিজ্ঞাসু চোখে অনিমার দিকে তাকায় শ্রীবাস।

কিন্তু অনিমাও তা জানে না।কোনো খবরই তো ওদের রাখা হয় না।

প্রতিবার অনিমা ভোট দেবার আগে শোনে,এবার কাকে ভোট দেবো?হাজার হলেও, শ্রীবাস একটু এবিষয়ে বেশি জানে।শ্রীবাস, যে চিহ্নে ভোট দিতে বলে সেই চিহ্নেই ভোট দেয়।এখন আবার নতুন পদ্ধতি হয়েছে,বোতাম চেপে ভোট দিতে হয়।আগে তো কাগজে দিতো।শ্রীবাসও যে স্বাধীনভাবে দেয় তা কিন্তু নয়।পিন্টুর কাছে একবার হলেও জিজ্ঞেস করে।সেও বাজারে থাকে। বর্তমানের হালচাল তারও জানা।তাছাড়া,শ্রীবাসের সাথে রাগারাগি থাকলেও এই ব্যাপারটায় কেমন যেন, ওর কাছে শুনতে ভালো লাগে।আর পিন্টুরও ভালো লাগবে, এটা মনে মনে ভাবে শ্রীবাস।

ভোটের দিন। জোনাইয়ের মনেও একটা আনন্দ।সারা জায়গায় যেন একটা উৎসব উৎসব ভাব।ওর মাও সাজছে। একবার ভেবেছিল,জোনাইকে রেখে যাবে।ওর ঠাম্মা আগেই ভোট দিয়ে এসেছে।ঠাম্মার সাথে যাবে বলে বায়না ধরেছিল।জোনাই ভেবেছে কোনো খাওয়া দাওয়া হয়তো।কোনো অনুষ্ঠান বাড়ীতে যাবার আগেই তো সবাই অমন সাজে।ওর মাকে বলে,“মা মা, আমিও ভোট খেতে যাবো।”

কাবেরী হেসে একাকার হয়ে যায়।তারপর ওকে আর না নিয়ে পারে না।

গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভোট হচ্ছে।সবাই চলছে।কিন্তু কোথাও যেন সব কিছু থমকে আছে।জোনাই দেখে,ওর ঠাকুর দা বসে আছে।শ্রীবাস আজকে নতুন পাজামা-পাঞ্জাবিটা পরেছে।সাদা তার রং।ভোট দেওয়া হয়ে গেছে।স্কুলের কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে গল্প করছে।

“ও ঠাকুর দা, ঠাকুর দা ”,বলে জোনাই শ্রীবাসের কাছে চলে আসে।

ওর মা বলে,“তুই ঠাকুর দার কাছে থাক।আমি ভোটটা দিয়ে আসি।”

কিন্তু ও থাকবে না।শ্রীবাস বলে,“ ওখান থেকে চকোলেট নে।চন্ডীর মা ওকে চকোলেট দাও তো।”

কিন্তু ও নেবে না।মায়ের সাথেই চলে গেলো।

ও আসলে ভোট কি তা জানে না।তবে এখন এই চকোলেটের মোহও ওকে আটকে রাখতে পারল না।তবে একেবারে, রুমে ঢুকতে দেয় নি ওকে।বাইরেই দাড়িয়ে রেখে কাবেরী রুমে ডুকে যায়।

কাবেরী বেরিয়ে দেখে একটু দূরে একটা বেঞ্চে বসে আছে জোনাই।একজন আর্মি ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে,ও শুধু শুনে যাচ্ছে।গালে আঙ্গুল দিয়ে কোনো কথা বলছে না।আর্মির হাতে বড় বন্দুক।তাছাড়া,এত কাছাকাছি হয়তো কোনো পুলিশ দেখে নি সে।তাই চুপসে গেছে।না হলে কত কথা বলে ও।পাখির মত কিচিরমিচির করতে থাকে।

আর্মিটি কাবেরীকে বলে,"মেরি ভি অ্যায়সি হি এক বেটি হ্যায়।"কাবেরী কিছু বলতে পারে না। ওর জানতে ইচ্ছে করছিল অনেক কিছুই।পরে আসতে আসতে কাবেরী ভাবছিল, কত কষ্ট নিয়ে এরা থাকে।তবুও থাকতে হয়।

১৩

ভোটের পর মিন্টু কেমন যেন বদলে গেছে।ওর বাড়ীতে বেশ লোকের আসা-যাওয়া বেড়েছে।সব সময় মোটর বাইক ওর কাছে থাকে।কোনো কাজ করে না।ভোটের আগে বউটা বাপের বাড়ী গিয়েছে।আর আসবে না মনে হয়।ওখানে থাকবে।

একদিন এসে মিন্টু বলল,“ তোমার বৌমাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। টাকা লাগবে।”এটা মনে মনে অনিমাও ভেবেছিল যে মিন্টু টাকা চাইতে পারে।তবে শ্রীবাসকে তা বলে নি।ব্যাংকে ওই টাকাগুলোর দিকে ওর চোখ।তাছাড়া ওই টাকাগুলো আছে বলেই তাদের একটু ভরসা আছে।নইলে দুয়োরে দুয়োরে ঘুরতে হতো।

এত দিন কোনো সুযোগ পাচ্ছিল না।এবার পেয়েছে।শুনেছে,ওর শশুর বাড়ী কোনো কিছুর অভাব নেই।তাহলে কেন?অনিমা ভাবে,এই সুযোগে টাকাগুলো নিয়ে নিতে চাইছে না তো।

শ্রীবাস অন্তত ব্যাংকের ওই টাকাগুলোর ব্যাপারে অনিমার কাছে কিছু না শুনে সিদ্ধান্ত নেয় না।সেটা মিন্টু জনে।তাই এসে মাকেই বলে।মা বললে বাবা দেবে।

অনিমা বলে,“কত টাকা লাগবে?”

লাগবে তো অনেক টাকা,তোমরা দশ হাজার দিলে হবে।ডেলিভারির সময়ও তো লাগবে।”

আসলে যারা শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন কোনোদিন করে নি,তারা টাকার মূল্য বুঝবে না।দশ হাজার টাকা যে কতটা শ্রম দিলে আসে তা মিন্টু জানে না।আর জানলেও মা-বাবার দিকটা একটু ভেবে দেখে না।ও ভাবে,এই ফাঁকে সে যদি টাকা গুলো নিতে না পারে তাহলে বড় দাদা পিন্টুই সব নিয়ে নেবে।

অনিমা ঠিক জানে না ব্যাংকে কত টাকা আছে।শ্রীবাসও ঠিক দ্যাখে

নি।অনিমা বলে,“ব্যাংকে কত আছে তা জানি না, দেখি পরে বলবো কত দিতে পারি?”

—"তা ব্যাংকের বই নেই?দাও আমি দেখছি।”

মিন্টুকে কেমন যেন ভরসা করতে পারে না ওরা। তাছাড়া,ওদের ব্যাংকে কত টাকা আছে তা জানলে সমস্যা হয়ে যেতে পারে। শ্রীবাস এটুকু বোঝে;বলে,“এখন রয়েছে কোথায়? পরে দেখে বলব?তোর টাকা লাগবে টাকা দিলে হল?”আর কিছু বলে না মিন্টু।আসলে দশ হাজার টাকা ওর কাছে অনেক।সেটা পেলে আপাতত হচ্ছে।তাছাড়া জোনাইয়ের কালী পূজোর খরচটার সাথে মিলিয়ে একটু কমই বলেছে সে।

মিন্টু চলে গেলে শ্রীবাস বলে,“অত টাকা দেওয়া যাবে না।আর ব্যাংকের বই তো ওর হাতে দেওয়াই যাবে না।”

রক্তের সম্পর্ক কোথায় পৌছে গেলে পিতা-পুত্রের মধ্যে এমন অবিশ্বাসের দেওয়াল তৈরী হয় তা ভাববার দরকার আছে।যাদেরকে এক সময় কত স্নেহে,কত আদরে বড় করেছে আজকে তারাই হয়ে উঠেছে যেন সব চেয়ে বড় শত্রু।

ব্যাংকের বইটি নিয়ে তাই পাশের বাড়ীর নন্দিতার মায়ের কাছে যায় শ্রীবাস।নন্দিতার মা অনেক দূর পড়েছে।তাছাড়া শ্রীবাসকে গেলে খুব যত্ন করে।পড়াশোনা তো তার বৌমারাও কম জানে না।কিন্তু একই পড়ালেখা অথচ তা এতটা ভিন্ন হয় কি করে শ্রীবাস এখনো এই রহস্য উন্মোচন করে নি।নন্দিতার ঠাম্মা আছে।ঠাকুরদাদা, রঙ্গলাল অনেক আগেই গত হয়েছেন।রঙ্গ দাদা যখন বিছানায় পড়ল দিনে অন্তত একবার দেখতে যেতো শ্রীবাস —বড় কাছের মানুষ ছিল।নন্দিতার মা তখন নতুন বৌ হয়ে এসেছিল।কি যত্নই না করতো রঙ্গকে।যার জন্যে আর কটা দিন বেশিই বেঁচে গিয়েছিলেন।বিছানায় শুয়ে শুয়ে শ্রীবাসকে বলেছিলেন,“বুঝলি শ্রী, আমার ঘরে লক্ষ্মী এসেছে।কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, বেশিদিন......” তখন শ্রীবাসও ভেবে ছিলো তার ঘরেও আসবে লক্ষ্মীরা।এখন এসেছে;তবে লক্ষ্মীরা নয়, শনিরা।

নন্দিতার ঠাম্মা এখন বিছানায় পড়ে।তাকে কি যত্নই না করে ওরা।দেখলে

সত্যিই ভালো লাগে। নন্দিতার মাকে দেখলে মনে হয় না বি.এ এম.এ পাশ করেছে সে।

“বৌমা,দেখো তো ব্যাংকে কয়টাকা আছে?”এর আগে শ্রীবাস বহুবার নন্দিতার মায়ের কাছে এসেছে।কখনো খারাপ মুখ দেখে নি।তাই তো এখনো আসে।অনেক ভরসা নিয়ে।

ফিরে এসে অনিমা কে বলে,“পাঁচ হাজার টাকার বেশি ওকে দেওয়াই যাবে না।”

অনিমা বোঝে টাকা কমে গেছে।তাই কত টাকা আছে সেটুকুও জিজ্ঞেস না করে বলে,“আমিও তাই ভেবেছি,যদি দিই ওই পাঁচ হাজারই দেবো।”

—"যদি নেয় নেবে।না নিলে নেবে না।এভাবে টাকা গুলো যেতে থাকলে শেষে—।ভাবছি জমিটুকুও সামনের বার ভাগে দিয়ে দেবো।”

সেই যে কত ছোটবেলা থেকে এই কৃষিকাজ শুরু শ্রীবাস এখন তা মনে করতে পারে না।তখন জমি-জিরেত কিছু ছিলো না।পরের জমিতে কাজ করে সংসার চলত।একবেলা খেলে আরেকবেলার চাল থাকতো না।সেই অবস্থা থেকে কত পরিবর্তন দেখেছে।

অনিমার বাপের বাড়ীর জমি পাবার আগে বলতে গেলে পরের জমিই ভাগে করতো।তখন গায়ে জোর ছিল।এখন সে জোর নেই।তাছাড়া,অনিমারও কষ্ট হয়ে যায়।তাই ভেবেছে জমি ছেড়ে দেবে।একটু সুখী-শান্তিতে কাটাবে।জীবনে আছে কি।টাকা পয়সা তো আর সঙ্গে নিয়ে যাবে না।তাই সময় থাকতে একটু সুখ করে যাওয়াই ভালো।কতজনকে মরতে দেখলো।কোথায়—কেউই তো কিছুই নিয়ে যেতে পারে নি।তাই অত সব ভাববার সময় নেই।কিন্তু তাই বলে,পথের ফকিরকে দিতে রাজি আছে শ্রীবাস!মিন্টুর মতোন ছেলেকে এক কড়ি দিতেও ওর মন সায় দেয় না!

তবুও খানিকটা অনাগ্র সত্ত্বেও দেয়।মিন্টু ভেবেছিল দেবেই না।যখন পাঁচ হাজার টাকা দিলো তখন আর 'না' বলল না।

নিয়েই নিলো।নেবার পর ভালো-মন্দ দুটো কথা পর্যন্ত বলল না।পাঁচ হাজার

কেন, দশ হাজার দিলেও যে মিন্টুর মনে কোনো কিছুই হতোই না তা দেখা যায়।ও মনে করে,অত টাকা আছে;দেবে –তাতে সমস্যা কোথায়?কিন্তু ওই কটা টাকায় যে কত কিছু হয় তা মিন্টুর মতো ছেলে বুঝবে না।একে তো শশুড় বাড়ীর গরম।তার উপর এখন ভোটে জিতেছে ওদের পার্টি।তার একটা জোর তো আছেই।

ভোটের আগে যাই হোক মাঝে মাঝে এখানে ওখানে একটু কাজে যেতো মিন্টু।এখন তা ও যায় না।বাড়ীতে বেশি একটা খায় না।মাঝে মাঝে বাড়ি এসে স্নান করে আবার বেরিয়ে পড়ে।অনিমা ভেবে পায় না, কোথায় খায় কি করে?

আবার কিছু জিজ্ঞেসাও করে না।শুধু শুধু আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেসা করে লাভ কি। যার কোনো অসুবিধা নেই,তার অসুবিধাগুলো উপলব্ধি করে সহানুভূতি দেখাতে গেলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশি।

তবে মা হিসেবে এক সময় তা হত।এখন হয় না।এখন ওদের মধ্যে বেশ দুরত্ব বেড়ে গেছে।মাতৃত্বের সংজ্ঞাটাও বোধহয় ওর কাছে পাল্টে গেছে।

১৪

আজ কয়দিন বেশ কাশি হচ্ছে শ্রীবাসের।একবার শুরু হলে যেন থামতেই চায় না।সেদিন মদ খেয়ে ঘরে এসেছিলো।কাশতে কাশতে এক পর্যায়ে বমি করে দেয়।এখন রাত্রে অনিমাকে একটু বেশি সচেতন থাকতে হয়!মনে মনে বলে,“ঈশ্বর, এই মানুষটারে একটু ভালো করে দাও।”ঈশ্বরের কানে সে আর্জি পৌছায় কিনা তা জানবারও উপায় নেই।অথচ কী অদ্ভূতভাবে সবাই তাকে ডেকে যাচ্ছে।কিসের ভরসায়?নাকি চতুর্দিকে অনুকরণেরই সংক্রমণ?

এখন শ্রীবাসের প্রতি মায়া হয় অনিমার।ও যে মদ খায়,তাতেও বাধা দেয় না।বলে,“তিলে তিলে সংসারটারে গড়লাম।এখন আমারই সেখানে ঠাই নেই।”এই সব দুঃখের কথা একমাত্র মদ খেয়েই বলে শ্রীবাস।অথচ স্বাভাবিকভাবে কি শান্তই না সে।অনিমাকে এখনো ভয় পায়।মদ খেলে মনের মধ্যে যে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হয়,তারই স্পর্শে মনের কত সংগোপিত কথারা বেরিয়ে আসে।এটা শুনতে শুনতে অনিমাও কেঁদে ফেলে।কি বলবে সে,কিছুই কি বলার আছে।সান্ত্বনা আর কত দেবে।সেও তো যদি খেতো তাহলে ওই একই কথা বলতো।

একরাত্রে কফের সাথে রক্ত বেরিয়ে আসে শ্রীবাসের।পিন্টু শান্তকে ফোন করে,“শান্ত, বাবাকে হাসপাতালে নিতে হবে।গাড়িটা নিয়ে আয়।” শান্ত এই পাড়ারই ছেলে।ওর একটা টাটাসুমো গাড়ী আছে।ভাড়ায় চালায়। একটু পরে গাড়ির হর্ণ শোনা যায়।কাবেরী আসে,অনিমাও থাকে সাথে।পিন্টু যায়।জোনাইকে পাড়ার একজনের কাছে রেখে যায়।

হাসপাতাল থেকে রিপোর্ট দিলে জানা যায়, শ্রীবাসের লিভারে ক্যান্সার হয়েছে।একটু একটু করে মদ ওর এই পরিণতি ডেকে এনেছে।অনিমাও জেনে যায়, আর হয়তো বেশি দিন থাকবে না সে।কিন্তু শ্রীবাসের যে হুশ নেই তা নয়।সেও বুঝতে পারে সব।অন্যদের তাকাতাকি দেখেই সে বুঝে ফেলেছে তার মারাত্মক কিছু হয়েছে।

হাসপাতাল বেডে শুয়ে আছে শ্রীবাস। মাঝে মাঝে ডাক্তার এসছেন।পিন্টু আর ওর বৌ বাড়ী গেছে।পাশের বেডের একজনের ফোন নাম্বার নিয়ে গেছে।মাঝে মাঝে ফোন করে খবর নিচ্ছে।

এবার ওই ফোনেই মিন্টুর গলা,"মা, বাবা,কেমন আছে?"

—"এখন একটু ভালো আছে।কেবল কটা খেলো।"

"আমি আসবো একটু পরে।কিছু আনতে হবে?"

—"না, কিছু আনা লাগবে না। "

ফোনটা রেখে দিতেই শ্রীবাস বলে,"কে ফোন করেছে,পিন্টুর মা?"কথাগুলো একেবারে অস্পষ্ট। তবে শ্রীবাসের ওমন কথা বুঝতে অনিমার একটুও দেরি হয় না।

বলে," মিন্টু—আসবে, তোমাকে দেখতে।"

ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুধু বলে,"ও....."

এই কয়দিন একবারের জন্যেও খবর নিই নি মিন্টু।শশুর বাড়ীতে ছিলো।ওকে কি কেউ জানাই নি যে ওর বাবা হাসপাতালে। কেই বা জানাবে?পিন্টু দুইবার ফোন করেছিল যদিও।ফোন বন্ধ দেখে আর চেষ্টা করে নি ও।

"পিন্টুর মা,জমিটুকু তোমার নামে লিখে দিয়ে যাবো—"শ্রীবাস ধীরে ধীরে বলে।

—"ও সব বাদ দাও তো।আগে সুস্থ্য হয়ে বাড়ী চলো।"এই কথাটুকু বলতে অনিমার কেমন যেন লাগে।সুস্থ্য কি আর হবে শ্রীবাস।যে মারণ রোগে তাকে ধরেছে,তা ধীরে ধীরে মেরে ফেলবে তাকে।কিন্তু সে কথা কি বলা যাচ্ছে তাকে?যাচ্ছে না।

শ্রীবাসও হয়তো তা বুঝেছে।বলে,"আর সুস্থ্য?আমি আর—"

তখনই ডাক্তার আর নার্সের একটা টিম ওদের কক্ষে প্রবেশ করে।মূহুর্তেই নিরবতার চাদরে ঢেকে যায় চারপাশ!

হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে পাড়ার অনেকেই একে একে দেখতে এসেছে।ছোট বৌমা তন্দ্রাও এসেছে।কোনো মনের টান হয়তো না,নিছক মানুষ কি বলবে এই ভয়ে।বারান্দায় চৌকিতে শুয়ে থাকে শ্রীবাস।উঠতে পারে না একা একা। কখনো অনিমা, কখনো কাবেরী এসে হাত ধরে একটু উঠোনে এনে বসিয়ে রাখে।এখন ওরা রান্না করে না—পিন্টুর ঘরে খায়।

হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরলেই কাবেরী বলেছে,“মা, এখন থেকে আর তোমার রান্না করতে হবে না—”

সকাল সকাল ভাত হলেই শ্রীবাসকে দিয়ে যায়।খুব একটা খেতে পারে না।ওষুধ খাবার জন্যে খেতে হয় তাই।তাছাড়া মুখের স্বাদ একেবারে চলে গিয়েছে।

শ্রীবাস সেদিন পিন্টুকে বলেছে,“জমিটুকু তো আমার নামে আছে।তোর মা'র নামে লিখে দিতে চাই। সুভাষ উকিল কে একটু খবর দে।”

পিন্টু বলে,“ঠিক আছে দিচ্ছি।” বাবার এই সিদ্ধান্তে পিন্টুর কিছু বলার নেই।অনিমা প্রথম প্রথম না করেছিল।সত্যি কথা বলতে অনিমা এটাই মানতে পারছে না,শ্রীবাস মরে যাবে।তাইই এই তোড়জোড়ও কেমন লাগছে ওর।শ্রীবাস বোঝায় ওকে,“যদি না মরি তো ঠিক আছে।কিন্তু যদি মরে যাই—তোমার কি হবে?অন্যের কাছে ঠেলা খাও তা আমি চাই নে।”

একদিন সত্যি সত্যি অনিমার নামে সম্পত্তিটুকু লিখে দিয়ে বিদায় নেয় শ্রীবাস।সকাল বেলায়, কেমন যেন কথা আরো আউড়ে আসে।কাউকে চিনতে পারছিল না।অনিমার হাতের পরেই মরে যায় শ্রীবাস।মরার সময় তেমন কিছু বলতে পারে নি সে।শুধু অনিমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো।অনিমা সেই চোখের তাকানো অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারে নি।

সেদিন অনিমা কাঁদতে কাঁদতে অনেককিছু বলেছিল।পাড়ার সবাই শুনেছিল, সেসব।তখন আর গোপনীয়তা ছিল না।যে মানুষটা কত দুঃখ বুকে চেপে চলে গেলো, কেউ কি বুঝবে?অনিমা বলেছিল,“তোরা, মা বাপ হচ্ছিস,বুঝবি?" এত সহজ সমীকরণ ওরা মেলাতে পারে নি অনেকেই।আসলে সময় না এলে যে কত কিছু জানা যায় না। একদা, ওরাও তো ভাবতে পারে না,এভাবে ওদের

জীবনের আকাশ জুড়ে মেঘ এসে ঢেকে দেবে সমস্ত আলো!

১৫

সময় ব্যাপারটা এমন কিছু যাতে আমাদের হাত থাকে না;অথচ সে আমাদের প্রতিমুহূর্তেই নতুন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয়।আর এক একজন মানুষের বয়স সেই সময় নদীতে পালতোলো নৌকো।সেও বয়ে চলেছে অবিরাম।এক সময় কোথাও না কোথাও থেমে যেতে হয়।মেনে নিতে হয়,সেই থেমে যাওয়া।অথচ অদ্ভুতভাবে কেউই যেন মরতে চাই না আমরা।যারা আত্নহত্যা করে, তারাও হয়তো সুন্দরভাবে বাঁচতে চেয়েছিল।

শ্রীবাসেরও ইচ্ছে ছিল আরো কয়েকটাদিন বাঁচবার। শেষ কদিন মদ খেতে পারে নি।ডাক্তার একেবারে নিষেধ করেছিল,একবারও মুখ ফুটে তাই সে মদের কথা বলে নি।বরং ওষুধগুলো ঠিকঠাক খেয়েছে।কিন্তু রোগটা তার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।তাই আর কারো কিছু করবার ছিল না।

শ্রীবাসের কত কথা অনিমার মনে পড়ে।যখনই একলা থাকে তখনই যেন ঘুরে ফিরে লোকটা আসে।কথা বলে,“পিন্টুর মা, খেয়ে নাও।” খায় না সে।এখন অভ্যেস এগারো বারোটা নাগাদ খাওয়া।বড় বউও জেনে গেছে,তাই ভাত একটু দেরী করে রান্না করে।জোনাই সকালে এ ও খেয়ে স্কুলে যায়।অনিমা মাঝে মাঝে দুপুর বেলা গিয়ে নিয়ে আসে।

প্রতিদিন সকালে পূজো দিয়ে তবেই খায়।একদিন হঠাৎ মনে পড়ল,শ্রীবাস বলেছিল,একটা মন্দির করবে।কিন্তু করে যেতে পারে নি।ওনার ইচ্ছেটা যেন এখন অনিমারও ইচ্ছে হয়ে গেছে।একদিন বড় বৌমাকে বলে,“বৌমা তোমার

বাবার একটা মন্দির করার খুব ইচ্ছে ছিল।করে তো যেতে পারল না।পিন্টুকে একটু বলো তো।”

কোনো কিছু পিন্টুকে সরাসরি বলে না অনিমা।কেমন যেন ভয় লাগে ওর।যদিও ওরই রক্তের—ছেলে!তবুও ওর সামনে গেলে সংকোচিত হয়ে আসে অনিমা।কিছু বলতে হলে,কাবেরীকে দিয়ে বলায় অথবা জোনাই গিয়ে ওর মাকে বলে,“মা, মা,ঠাম্মা ওষুধ কিনবে —ক'টা টাকা দাও।”

অনিমারও যে শরীরটা ভালো যাচ্ছে তা নয়।সারা শরীর জুড়ে ব্যথা।একদিন, ওষুধ না খেলে ব্যথা যেন আরো ছড়িয়ে যায়।উঠতে পারে না।শ্রীবাস মারা যাবার পর সেও যেন কেমন অচল হয়ে গেছে।এতদিন দুটো পাখি ছিল;সুখ-দুঃখ ছিল;তবুও মনের কথা বলতে পারতো। এখন —এখন তা পারে না।

মাঝে মাঝে অমলার মায়ের কাছে যায়।সেও ভালো নেই।সেই যে সেই বউবেলায়, অমলার মা আর অনিমার প্রায় এক সময় বিয়ে হয়েছিল।তারপর এতদিন তারা পার করে এসেছে—

“কেমন আছিস, পিন্টুর মা?গত রাত্রে কান্তি কবিরাজ মারা গেলো!”

—“কখন গেলো?শুনলাম না তো?”

“ রাত সাড়ে দশটার দিকে।”

অনিমা বলে,“তখন এত ডাক্তার ছিল না।কত মানুষের জীবন দিয়েছে কান্তি কবিরাজ?”

বলতে বলতে অনিমার মনে পড়ে।পিন্টু খেলতে খেলতে এক বার এসে বলে,ওর পায়ে কিসে কামড়িয়েছে।সন্ধ্যার সময় —কোথায় যাবে, কী করবে!কান্তিকবিরাজ ছাড়া ভরসা তো কেউ নেই।

গিয়ে বলে,“কবিরাজ মশাই,আমার পিন্টুকে একটু দেখো তো। কী একটা গাছের শেকড় দিল—সেরে গেলো।”

সেই কবিরাজও জীবনের কাছে হেরে গেলো আজ।একবার দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে হল,“অমলার মা,চল,দেখে আসি একটু—”

“আমার তাবিজ আছে।মরা বাড়ী যাওয়া নিষেধ আছে রে।”

—“তাবিজ খুলে রেখে চল।এসে পরে নিস।”

কিন্তু অমলার মায়ের তেমন কোনো ইচ্ছেই দেখা গেলো না।বলল,“এতক্ষণ মনে হয়, শস্মানে নিয়ে গেছে।”

জোনাইয়ের আজকে স্কুল নেই।বাড়ীতেই আছে।ও বাড়ীতে থাকলে, বোঝাই যায়।ওর থেকে ওর মায়ের গলাই বেশি শোনা যায়।এটা করিস না, ওটা কর।মেয়েটাকে এত চোখের পরে রাখার কোনো কারণ খুঁজে পায় না অনিমা।মনে মনে বলে, ছুটির দিনেও যেন একটু বিরাম নেই।মেয়েটাকে এমন করলে শেষে কী হয় তা দেখার ইচ্ছে আছে অনিমার।

শ্রীবাসের সেই হাসপাতালে নেওয়া থেকে মৃত্যুর পরে কত কাজে কত টাকা চলে গেলো।অনিমা ব্যাংক থেকে সবই দিয়েছে।তাছাড়া,বয়স্ক ভাতা পেলেই কত কিছু কিনে আনে বাড়ীর জন্য।নিজের কাছে রেখে দেয়।শ্রীবাস বেঁচে থাকতে ব্যাংকের ব্যাপার-স্যাপার সেই দেখতো।যেভাবে হোক,টাকা তোলার কাজটি করতে পারত।কিন্তু অনিমা তা পারে না।তাই ব্যাংকের কাগজপত্র সব কাবেরীর কাছেই রেখে দিয়েছে।পিন্টুর চেয়ে কাবেরীর কাছে রাখাটাই যেন বেশি নিরাপদ বোধ করে অনিমা।আর বলে,“টাকা তুলতে হলে, আমাকে বলো—আমার টিপসই লাগবে তো!”

তবে ব্যাংকেও যে একেবারে বেশি টাকা আছে তা নয়।কথায় আছে,রাখা টাকা ব্যয় করতে থাকলে রাজার ধনও একদিন শেষ হয়। কতটাকাই বা ছিল।তবে অনিমা আর টাকার হিসেব রাখতে চায় না।সে তা রেখে কিই বা করবে।যে কটা দিন বাঁচে যেন কাবেরী এখন যেমন আছে তেমনই থাকে!

১৬

রাত্রে ঘুমোলে অনিমার ঘুম আসে না অনেকক্ষণ। এক সময় ঘুম আসে।আবার রাত থাকতেই ভেঙে যায়।এমন ওর অনেক দিন ধরেই হয়ে আসছে।ও বুঝতে পারে—ওষুধ খাবার জন্যে এমন হচ্ছে।কিন্তু কিছুই করার নেই।একটু ভালো থাকতে গেলে তো তা করতেই হবে।

সেরাত্রেও সকাল সকাল খেয়ে বিছানায় গিয়েছে।হঠাৎ কাবেরী ছুটে এলো।বলল," মিন্টুকে, কারা যেন মেরেছে?হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে!"

মিন্টুকে নিয়ে সেই ভোটের সময় থেকেই অনিমার চিন্তা আছে।তখন থেকেই ওর ঘোরা ফেরা ভালো মনে হয় নি।যাদের সাথে মেশে তাদেরকেও সন্দেহও হয় অনিমার।কতবার কিছু বলতে গিয়েও বলে নি।বাজারে থাকে সারাক্ষণ। কোথায় কি খায় তারও তো ঠিক নেই।এমন একটা আভাস যেন পাচ্ছিল অনিমাও।কিন্তু সেটা যে এমন ভাবে সত্যি হবে —তা জানা নেই।

কাবেরী আর অনিমা দ্রুত হেটে যায় বাজারের দিক।রাস্তায় একেবারে বেশি লোক নেই।রোড লাইটগুলো নিরবচ্ছিন্ন আলো দিচ্ছে।সেই আলোয় পথ চিনে চিনে ওরা বাজারে পৌছোয়।ততক্ষণে মিন্টুকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।কেউ যেন কিছু বলছে না অনিমাকে।পিন্টুর দোকানও বন্ধ;পিন্টুও সাথে গিয়েছে ওকে নিয়ে হাসপাতালে।

কার কাছে যেন অনিমা জানতে চায়,"কি হয়েছে আমার মিন্টুর?"বলতে বলতে আর্তনাদ করে ওঠে অনিমা।শুধু জানতে চায়,"আমার মিন্টু বাঁচবে তো? বউটাও বাপের বাড়ী পড়ে আছে।"

কয়েকজন এসে সান্ত্বনা দিয়ে বলে,"কিছু হবে না।সেরে যাবে। সবাই তো হাসপাতালে নিয়ে গেছে।"

কিন্তু কি হয়েছে আর কারা এই কাজ করল তাও তো জানে না অনিমা।

কাদঁতে কাদঁতে বলে,“আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো।”

সেই হাসপাতাল যেখানে এই তো কয়দিন আগে শ্রীবাসকে নিয়ে কতদিন থেকে গেছে।হাসপাতালের প্রসঙ্গ আসতেই কেমন যেন মনের মধ্যে ডোরা কেটে যায় অনিমার।কত শত বিপদ নিয়ে মানুষ আসে প্রতিদিন। ভাবতেই,গা শিউরে উঠে ওর।

সেই হাসপাতালে কার যেন মোটর বাইকে করে পৌছে যায় কাবেরী আর অনিমা।যেন পাগলের মতো হয়ে গেছে;কাবেরী বারবার শান্ত করার চেষ্টা করে।পিন্টুকে ফোন করে কাবেরী,“ মাকে নিয়ে হাসপাতালে এসছি।আমরা নিচেই আছি।তোমরা কোথায় আছো?”

পিন্টু বলে,“রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।এমারজেন্সি বিভাগে ভর্তি আছে।মাকে বলো না।আমি আসছি।”

তবে সে তো জানে অনেকটা। বাজার থেকে শুনেছে ;কিন্তু শাশুড়ীকে বললে তার অবস্থা হয়তো খারাপ হবে —তাই কিছু বলে নিঃ

ভোট অনেকদিন হয়ে গেলেও পঞ্চায়েতের প্রধান কে হবে তা নিয়ে বেশ মতের বিরোধ চলছিল ওদের মধ্যে।মিন্টু যে দল করে ওদের দল ভোটে জিতে গেলেও অনেক কারণে তারা ক্ষমতায় বসতে পারছিল না।অন্য কয়েকটি দলও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।তাই নিয়েই এই মারামারি।রাতের দিকে মিন্টু সম্ভবত বাড়ী ফিরবার পথে বাজারে ছিল।তখনই কারা এসে যেনো ওকে রড দিয়ে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে।যেখানে মেরেছে লাল রক্ত জমাট বেধে গেছে।তা দেখে কাবেরীর তাই কেমন যেন সন্দেহ জাগছে—মিন্টু আদৌ বেঁচে আছে কি নেই।পিন্টুও বাজারে থাকে।এই ভয় ওরও করে।পিন্টুকে বারবার বোঝায়,যেন কোনো রাজনীতির মধ্যে না যায়।সে যায় ও না।

নিচেই যতটা সময় ওরা দাঁড়িয়ে ছিল, তা এমনও বেশি নয়—অনিমার শরীর একে তো ভালো না।ওর গা কাঁপছে।বারবার কাবেরী কি বলছে,“বৌমা ওর

কিছু হয় নি তো?”

কাবেরীর কাছে কত ফোন আসছে।বার বার একটু দূরে গিয়ে কথা বলছে।তবে এটুকু বলেছে,“পার্টি নিয়ে কি গন্ডোগোল হয়ে মারামারি হয়েছে।”

কিন্তু মারামারি হলে এত সবাই চিন্তিত কেন।অনিমার কাছে কিছুই যেন ভালো লাগে না।বলে,“বৌমা তোমরা মনে হয় কি লুকোচ্ছো?আমার কাছে লুকোনোর কি আছে?বলো না।আমার মিন্টু কেমন আছে?ও বেঁচে আছে তো?”

কাবেরী কি বলবে।সেও তো একেবারে ভালো জানে না।তবে অবস্থা যে গুরুতর তা বোঝাই যাচ্ছে,তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,“ভর্তি হয়ে গেছে।ডাক্তার দেখছে।”

পৃথিবীতে মা হওয়া যে কতটা যন্ত্রনার, তা যে না হয়েছে সে বুঝবে না।আর সন্তানের বিপদ মাকে যে কতটা আলোড়িত করে তাও মা ছাড়া কেউ বুঝবে না।

একটু পরে পিন্টু এসে ওদের নিয়ে যায়।কতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠেছিল অনিমা তা মনে রাখতে পারে নি।অনিমা দেখে,মিন্টু যাদের সাথে মিশতো তারাও এসেছে।ওদের দেখে অনিমা ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হতে থাকে।চোখের সামনে কেমন যেন শত্রু বলে মনে হচ্ছে।ওদের জন্যেই তো তার ছেলেটার আজকে এই অবস্থা।ওর মুখটি একবার দেখার জন্য কেমন যেন উতলা হয়ে আছে।মিন্টুকে যে ঘরে নেওয়া হয়েছে,সে ঘরে শুধু নার্সরা যাওয়া আসা করছে।কিন্তু তাদের সাথে কথা বলবার কেউ সাহস পাচ্ছে না।মিন্টুর দলের যে লিডার সেও এখন চুপসে গেছে।তার কাছেও বারবার ফোন আসছে।বার বার একটু দূরে গিয়ে কি কথা সেরে আসছে।ওরা ওরা কি যেন বলছে।

একটু বাদেই কাবেরীর ফোনটা বেজে ওঠে।ফোনটা রেখে বলে,“এই হাসপাতালেই ছোটবউকে নিয়ে আসা হচ্ছে।ওর ডেলিভারি ডেট আজকে।”

এর আগেই খবর শুনেছে ছোট বউ।কিন্তু ওর অবস্থা এতোই খারাপ যে

আসার অবস্থা ছিল না।ছোট বউয়ের ভাই এসেছে।কাবেরীও ওকে ভাই বলে।ওকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলে,"তন্দ্রাকেও ভর্তি করা হচ্ছে তুমি যাও।ওরা মনে হয়, এতক্ষণে এসে যাবে।"

অনিমা যেন চোখের সামনে সরষে ফুল দেখে।বারবার শুধু ঈশ্বরকে ডাকে।এই মূহুর্তে সে ছাড়া আর কেই বা আছে ভরসা করবার মতো।যাদের ভরসা করে প্রতিবার ভোট দিয়েছে,সেই তারাই যে অনিমার এত বড় সর্বনাশ করবে কে জানে।

একটু পরে ডাক্তার বেরোতেই ওনার দিকে সবাই যেন সতর্ক হয়ে যায়।লিডারকে বলে,"কিছু বলা যাচ্ছে না;প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।"

কত আর থাকবে রক্ত।ভোররাত তখন;সবাই তখনও জেগে;কেউ কেউ জিমোচ্ছে।একজন নার্স এসে কাকে যেন দুঃসংবাদটা দেয়।মুহুর্তেই যেন সবাই কেমন বদলে যায়।নিরবে চোখের জল ফেলে কেউ কেউ।অনিমা সারা মেঝে গড়াতে থাকে।নিজেকে সে সামলে রাখতে পারে নি;থেকে থেকে কেঁদে উঠেছে শুধু।এক পর্যায়ে ঘুমের কোলে ঢোলে পড়ে।না অচেতন হওয়া যায় বোঝা যায় না।

সকালে উঠতেই কাবেরী বলে,"মা, মিন্টুর ছেলে হয়েছে।"

কিন্তু একেবারে পাথর হয়ে গেছে অনিমা। কোনো কথা নেই মুখে ওর।

১৭

মিন্টুর দেহ যখন বেরিয়ে আনা হল—বিদ্যুত বেগে অনিমা ছুটে যায় ওর দিকে। গিয়ে দেখে,সেই ছেলেটা ওর;মুখটা কেমন যেন সাদা হয়ে গেছে।ব্যান্ডাজ করা চারপাশে। ছেলের মৃতদেহ ছুয়ে কান্না করছে মা।কাবেরীও চোখের জল মোছে।একটু পর ওকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হবে।

তন্দ্রার অপারেশন হয়েছে।হেটে আসার তারাও কায়দা নেই।কিন্তু শেষবারের মতো তাকেও তো দেখাতে হবে।ওকে একটা টলিতে করে,প্রসূতি বিভাগ থেকে আনা হয় মিন্টুর সামনে।ওর পাশে ছোট্ট ছেলে।মিন্টু বডি সাদা কাপড়ে ঢাকা আছে।ছেলেটি ঘুমোচ্ছে।বাবাকে শেষবারের মতো ওকে দেখাবে বলে—এনেছে এখানে।হয়তো কিছুই মনে রাখবে না ও।তবুও তো, এই এক রাত্রে যে গল্প রচিত হল তারই সাক্ষী থাকবে সে।

তন্দ্রাও কাদঁছে।খুব কান্না করছে।বলছে,“কতবার বলেছি,ওদের সাথে মিশও না।বাইরে যেতে চাইলো;আমি ভাবলাম—তাও ভালো।অন্তত এভাবে মরতে তো হবে না ওর।"

কি স্বাদ পেয়েছিল রাজনীতিতে —;দুদিনে শেষ হয়ে গেল জীবনটা।কতই বা বয়স হয়েছে মিন্টুর।

তন্দ্রার পাশে ছেলেটা;ওকে একটু জাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে।জেগে আছে সে।তার কাছে সব কিছুই নতুন।সে জানে না তার বাবা —যার রক্ত তার শরীরে বইছে সে তারপাশে নিঃশব্দে শুয়ে আছে।কোনোদিনই তাকে দেখতে পাবে না আর।সেও দেখবে না তাকে।

অনিমার সাথে অনেকেই কথা বলবার চেষ্টা করেছে।কিন্তু সে কারো সাথে কথা বলে নি।মিন্টুর ছেলেটাকে দেখছে শুধু।ভাবছে, মিন্টুই ফিরে এসেছে।ঠিক যেন মিন্টুর চেহারা নিয়েছে।

ইতিমধ্যে খবরের লোকেরা এসে গিয়েছে।নিচে পিন্টু গিয়ে তাদের সামনে বলছে।তারা অনিমার অপেক্ষায় আছে।

এতদিন কত টি.ভিতে দেখেছে ছেলে হারা মায়ের হাহাকার। আজ সেই ছেলেহারা মা হয়ে গেছে অনিমা।কিন্তু সেসবের কিছুই মনে নেই ওর।ক্যামেরার সামনে বলে,“আমি কিছু বলবো না।আমি কিছু বলতে পারবো না।”

কিছু বলবার অনেক অনুরোধ করে সাংবাদিকেরা। কিভাবে যেন অনিমা বুঝতে পেরেছে, এদের সামনে বলে কিছুই হবে না।কত মা কতবার কান্না করেছে।কি হল তাতে।তাই কিছুই বলে না;যতই বলছে, ততই যেন কাঠ হয়ে যাচ্ছে অনিমা।কারো সাথে কিছু বলবে না।

১৮

বাড়ীটা কেমন যেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে।শ্রীবাস মরার পরেও এমন হয় নি।তার মরার বয়সও হয়েছিল;অসুখও ছিলো আবার।কিন্তু মিন্টুর মৃত্যু সবাই ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারছে না—!মিন্টুর ছেলেটিকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে অনিমার।এই কয়দিনে বেশ বড় হয়ে গেছে;কাবেরীর সাথে,জোনাইয়ের সাথে নিয়মিত কথা হয় তন্দ্রার। মৃত্যু যেন বড় শিক্ষক—পর পর দুটি মৃত্যু কত কী শিখিয়ে দিয়ে গেলো।

জোনাই বলে,“ভাই কেমন আছে?”

—“ভালো আছে।তোমরা একদিন এসে দেখে যাও।”তন্দ্রার গলাটা ভারী হয়ে আসে।কত কিছু মনে পড়ে যায়।জোনাইকে ওর কাকা খুব স্নেহ করতো।ওর মা বাবার সাথে হাজার শত্রুতা থাকুক।ওর কথা ভেবেও তার কান্না পায়।

কাবেরী কাছে দিতেই তন্দ্রা বলে,“ দিদি,ওর ঠাকুরমাকে নিয়ে, জোনাইকে নিয়ে ঘুরে যাও—আমরা তো যেতে পারছি না।”এবাড়ীতে আসতেও যে তন্দ্রার মন চায় তা নয়।কার জন্যে আসবে;যে ওকে ভরসা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই তো চলে গেছে।সে এখন কোথায় আছে!

আসলে মানুষ মরে গেলে তার সাময়িক অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ হয় না;দুঃখ হয় তার সাথে কাটানো সময়ের কথা ভেবে।সেই বিয়ের পর থেকে এক সঙ্গে কতটা দিন কাটালো ওরা।ঘর করল—থাকা হলো না তার আর।কতকগুলো মানুষের হিংস্রতার স্বীকার হয়েছে সে।আর ফিরে আসবে না।হয়তো তাদেরও ছেলেমেয়ে আছে; বা-বাবা আছে;আছে তন্দ্রার মতো প্রিয়তমা!

হাসপাতালে অনেক টাকা বিল হয়েছিল।সেই সময় সবাই মিলে দিলেও পরে অনিমার ব্যাংক থেকে তুলে পিন্টু সবাইকে দিয়ে দেয়।কিছু টাকা ছিল,এনে অনিমার কাছে দেয়।সেই টাকা নিয়ে কাবেরী, জোনাই আর অনিমা ছোটবউয়ের বাপের বাড়ী যায় একদিন;কিছুটাকা ছোটবৌয়ের হাতে দিয়ে আসবে।যতই বাপের বাড়ী থাকুক।ছেলেটার তো এ বাড়ীর কেউ আছে।

প্রথমে কিছু সময় কান্নায় কান্নায় কেটে যায়।ছেলেটাও বেশ মোটাসোটা হয়েছে—ছোটবেলায় মিন্টুও যে এমন ছিল।চুলগুলো এমন কালো হয়েছে,ওকে কোলে নিয়ে আর ছাড়তে চায় না অনিমা।তন্দ্রা কাবেরীকে এক ফাঁকে বলেছে,“দিদি, মা, আমার এখানে কিছু দিন থাকুক।নাতির সাথে কিছু দিন কাটাক। একটু মন ভালো হবে।”

কাবেরীও দেখেছে তাই;ছেলেটাকে পেয়ে যেন অনেক দুঃখ ভুলে গেছে অনিমা।যেন ওর সাথে কথা বলছে—ছেলেটাও হেসে হেসে উঠছে। ওর হাসি অনিমার সব কান্না নিয়ে নিয়েছে মুহুর্তেই।

কাবেরী বলে,“মা, তন্দ্রা তোমাকে ওর কাছে কয়দিন থেকে যেতে বলছে।”

অনিমাও যেন তাই চাইছিল।বলে,“হ্যাঁ, কয়দিন থেকেই যাই।"

লেখক পরিচিতিঃ

লেখক এখন লিখে যাচ্ছে।ইতিপূর্বে প্রকাশিত উপন্যাস "কক্ষপথের বাইরে", প্রবন্ধ গ্রন্থ " প্রথমত নিবেদিত" এবং কাব্যগ্রন্থ " বিষন্নতা তোমাকে"।

এটি লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস।